উপন্যাস

রক্তের বিষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. কুকুরগুলো খ্যাঁকাচ্ছে 2
২. বেড়ালকে ফাঁসি 12
৩. সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ.......................... 22
৪. উঁকি মেরে 41
৫. অন্ধকার জিমনাশিয়ামে 50
৬. পুলিশ তেমন কিছু করেনি.......................... 64
৭. নানক চৌধুরী.......................... 74
৮. ট্যাক্সিতে বসে 84
৯. বেগম অঝোরে কেঁদেছে 102
১০. জায়গাটা গরম 105
১১. ভোরে ওঠা অভ্যাস 112
১২. বিশাল কলেজবাড়ি.......................... 126
১৩. সত্যুর হাতে-মুখে রক্ত.......................... 135

১. কুকুরগুলো খ্যাঁকাচ্ছে

রক্তের বিষ – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় – প্রেমের উপন্যাস

কুকুরগুলো বাইরে খ্যাঁকাচ্ছে। সে এমন চ্যাংড়ামি যে মাথা গরম হয়ে যায়।

গগনচাঁদ উঠে একবার গ্যারাজ-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লাইটপোস্টের তলায় একটা ভিখারি মেয়ে তার দুটো বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসেছে। কাপড়ের আঁচল ফুটপাথে পেতে তার ওপর উচ্ছিষ্ট, খাবার জড়ো করেছে। কুকুরগুলো চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে লাগাতার।

গগনচাঁদ একটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল নিশানায় ছুঁড়ে কুকুরটার পাছায় লাগিয়ে দিন। কুকুরটার বীরত্ব ফুস করে উড়ে যায়, কেউ কেউ করতে করতে নেংচে সেটা পালায়। সঙ্গে আরগুলো। গগনচাঁদ ফের তার গ্যাজ-ঘরে এসে বসে। রাত অনেক হল। গগনচাঁদের ভাত ফুটছে, তরকারির মশলা এখনও পেষা হয়নি।

মশলা পিষবার শিল-লোড়া গগনের নেই। আছে একটা হামানদিস্তা। তাইতেই সে হলুদ গুঁড়ো করে, ধনে-জিরে ছাতু করে ফেলে। একটা অসুবিধে এই যে হামানদিস্তায় একটা বিকট টংটং শব্দ ওঠে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। আর এই বিরক্তির ব্যাপারটা গগন খুব পছন্দ করে।

এখন রাত দশটা বাজে। গ্রীষ্মকাল। চারপাশেই লোকজন জেগে আছে। রেডিয়ো বাজছে, টুকরো-টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে, কে এক কলি গান গাইল, বাসন-কোসনের শব্দও হয়। গগন হামানদিস্তা নিয়ে হলুদ গুঁড়ো করতে বসে। আলু ঝিঙে আর পটল কাটা আছে, ঝোলটা হলেই হয়ে যায়।

গ্যারাজটায় গাড়ি থাকে না, গগন থাকে। গ্যারাজের ওপরে নিচু ছাদের একখানা ঘর আছে, সেটাতে বাড়িঅলা নরেশ মজুমদারের অফিসঘর। কয়েকখানা দোকান আছে তার কলেজস্ট্রিট মার্কেটে। নিজের ছেলেপুলে নেই, শালিদের দু-তিনটে বাচ্চাকে এনে পালে-পোষে। তার বউ শোভারানি ভারী দজ্জাল মেয়েছেলে। শোভা মাঝে মাঝে ওপরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, শিলনোড়া না থাকে তো বাজারের গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে ভরে বিক্রি হয়, না কি সেটা কারও চোখে পড়ে না। হাড়-হারামজাদা পাড়া-জ্বালানি গু-খেসোর ব্যাটারা সব জোটে এসে আমার কপালে!

সরাসরি কথা বন্ধ। বাড়িতে একটা মাত্র কল, বেলা নটা পর্যন্ত তাতে জল থাকে। জলের ভাগীদার অনেক। গ্যারাজে গগন। রাতে নরেশের কিছু কর্মচারী শোয় ওপরতলার মেজেনাইন ফ্লোরে। সব মিলিয়ে পাঁচজন। ভিতর-বাড়ির আরও চার ঘর ভাড়াটের ষোলো-সতেরোজন মিলে মেলাই লোক। একটা টিপকল আছে, কিন্তু সেটা এত বেশি ঝকাং ঝকা হয় যে বছরে নমাস বিকল হয়ে থাকে। জল উঠলেও বালি মেশানো ময়লা জল উঠে আসে। তাই জলের হিসেব ওই একটা। মাত্র কলে। অন্য ভাড়াটেদের অবশ্য ঘরে ঘরে কল আছে, কিন্তু মাথা-উঁচু কল বলে তাতে ডিমসুতোর মতো জল পড়ে। উঠোনের কলে তাই হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। একমাত্র নরেশের ঘরেই অঢেল জল। নিজের পাম্পে সে জল তুলে নেয়। কিন্তু সে জল কেউ পায় না, এমনকী তার কর্মচারীরাও নয়। গগনচাঁদ কিছু গম্ভীর মানুষ, উপরন্তু কলেজ আর তিনটে ক্লাবের ব্যায়ামশিক্ষক, তার বালতি কিছু বড় এবং ভারী। কাউকে সে নিজের আগে জল ভবতে দেয় না। নরেশ মাস তাকে আগে জলের বখেড়ায় গগনচাঁদকে বলেছিল, আপনার খুব তেল হয়েছে। তাতে গগনচাঁদ তার গলাটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে চড় তুলে বলেছিল, এক থাপ্পড়ে তিন ঘণ্টা কাঁদাব। সেই থেকে কথা বন্ধ।

গগন গুঁড়োমশলা কিনতে যাবে কোন দুঃখে! ভেজাল আর ধুলোবালি মেশানো ওই অখাদ্য কেউ খায়? তা ছাড়া হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো করলে শরীরটাকে আরও কিছু খেলানো হয়। শরীর খেলাতে গগনের ক্লান্তি নেই।

গ্যারাজের দরজা মস্ত বড়। বাতাস এসে কেরোসিনের স্টোভে আগুনটাকে নাচায়। গগন উঠে গিয়ে টিনের পাল্লা ভেজিয়ে দিতে যাচ্ছিল। নজরে পড়ল আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে। গ্রীষ্মের শেষ, এবার বাংলা শুরু হবে। ঠান্ডা ভেজা একটা হাওয়া এল। গগন ভ্রু কুঁচকে তাকায়। অন্য ঋতু ততটা নয় যতটা এই বাদলা দিনগুলো তাকে জ্বালায়। গ্যারাজের ভিত নিচু, রাস্তার সমান-সমান। একটু বৃষ্টি হলেই কল কল করে ঘরে জল ঢুকে আসে। প্রায় সময়েই বিঘত-খানেক জলে ডুবে যায় ঘরটা। সামনের নর্দমার পচা জল। সেই সঙ্গে উচ্চিংড়ে, ব্যাং এবং কখনও-সখনও ঢোঁড়া সাপ এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। তা সে-সব কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ নিয়ে মাথা ঘামায় না গগন। ময়লা জলটাকেই তার যত.ঘেন্না। দুটো কাঠের তাক করে নিয়েছে, তোরঙ্গটা তার ওপর তুলে রাখে, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে স্টোভ জ্বেলে চৌকিতে বসে সাহেবি কায়দায় রান্না করে গগন বর্ষাকালে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তাই আকাশে মেঘ দেখলে গগন খুশি হয় না।

এখনও হল না। কিন্তু আবার বর্ষাবৃষ্টিকে সে ফেলতেও পারে না। এই কলকাতার শহরতলিতে বৃষ্টি যেমন তার না-পছন্দ, তেমনি আবার মুরাগাছা গায়ে তার যে অল্প কিছু জমিজিরেত আছে সেখানে বৃষ্টি না হলে মুশকিল। না হোক বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মন ধান তো হয়ই। তার কিছু গগন বেচে দেয়, আর কিছু খোরাকি বাবদ লুকিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

মেঘ থেকে চোখ নামিয়েই দেখতে পায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর চৌহদ্দি ফুড়ে সুরেন খাঁড়া আসছে। সুরেন এক সময় খুব শরীর করেছিল। পেটের পেশি নাচিয়ে নাম কিনেছিল। এখন একটু মোটা হয়ে গেছে। তবু তার দশাসই চেহারাটা রাস্তায়-ঘাটে মানুষ দুপলক ফিরে দেখে। সুরেন গুন্ডামি করে না বটে, কিন্তু এ তল্লাটে সে চ্যাংড়াদের জ্যাঠামশাই গোছের লোক। লরির ব্যাবসা আছে, আবার একটা ভাতের হোটেলও চালায়।

সুরেন রাস্তা থেকে গোঁত্তা-খাওয়া ঘুড়ির মতো ঢুকে এল গ্যারাজের দিকে।

বলল, কাল রাত থেকে লাশটা পড়ে আছে লাইন ধরে। এবার গন্ধ ছাড়বে।

গভীর গগন বলল, হ।

ছোকরাটা কে তা এখনও পর্যন্ত বোঝা গেল না। তুমি গিয়ে দেখে এসেছ নাকি?

না। শুনেছি।

ঘরে ঢুকে সুরেন চৌকির ওপর বসল। বলল, প্রথমে শুনেছিলাম খুন। গিয়ে দেখি তা নয়। কোনওখানে চোট-ফোট নেই। রাতের শেষ ডান গাড়িটাই টক্কর দিয়ে গেছে। কচি ছেলে, সতেরো-আঠারো হবে বয়স। বেশ ভাল পোশাক-টেশাক পরা, বড় চুল, জুলপি, গোপ সব আছে।

হু। গগন বলল।

হামানদিস্তার প্রবল শব্দ হচ্ছে। ভাত নেমে গেল, কড়া চাপিয়ে জিরে-ফোড়ন ছেড়ে দিয়েছে গগন। সঙ্গে একটা তেজপাতা। সাঁতলানো হয়ে গেলেই মশলার গুঁড়ো আর নন দিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে।

সুরেন খাঁড়ার খুব ঘাম হচ্ছে। টেরিলিনের প্যান্ট আর শার্ট পরা, খুব টাইট হয়েছে শরীরে। বুকের বোতাম খুলে দিয়ে বলল, বড় গুমোট গেছে আজ। বৃষ্টিটা যদি হয়!

হবে। গগন বলে, হলে আর তোমার কী! দোতলা হাঁকড়েছ, টঙের ওপর বসে থাকবে।

সুরেন ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল, তারপর সেটা গামছার মতন ব্যবহার করতে লাগল মুখে আর হাতে। ঘষে ঘষে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, তোমার ঘরে গরম বড় বেশি, ড্রেনের পচা গন্ধে থাক কী করে?

প্রথমে পেতাম গন্ধটা। এখন সয়ে গেছে, আর পাই না। চার সাড়ে চার বছর একটানা আছি।

তোমার ওপরতলার নরেশ মজুমদার তো আবার বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ঝিল রোডে। একতলা শেষ, দোতলারও ছাদ যখন-তখন ঢালাই হয়ে যাবে। এক বার ধরে পড়ো না, নীচের তলাকার একখানা। ঘর ভাড়া দিয়ে দেবে সস্তায়।

গগন ভাতের ফেন-গালা সেরে ঝোলের জল ঢেলে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল, তা বললে বোধহয় দেয়। ওর বউ শোভারানি খুব পছন্দ করে কিনা আমাকে। একটু আগেও আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিল।

একদিন উঠে গিয়ে কাপড় মারবে একটা, আর রা কাটবে না।

গগন মাথা নেড়ে বলল, ফু! একে মেয়েছেলে, তার ওপর বউ মানুষ।

বলে হাসে গগন। একটু গলা উঁচু করে, যেন ওপরতলায় জানান দেওয়ার জন্যই বলে, দিক না। একটু গালমন্দ, আমার তো বেশ মিঠে লাগে। বুঝলে হে সুরেন, আদতে ও মাগি আমাকে পছন্দ করে, তাই ঝাল ঝেড়ে সেটা জানিয়ে দেয়। মেয়েমানুষের স্বভাব জানো তো, যা বলবে তার উলটোটা ভাববে।

বলেই একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে গগন। সুরেনও ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মুখে একটু হাসি দুজনেরই। শোভারানির অবশ্য কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ওপরে কোনও বাচ্চা বুঝি স্কিপিং করছে, তারই ঢিপ ঢিপ শব্দ আসছে, আর মেঝেতে ঘুরন্ত দড়ির ঘষা লাগার শব্দ।

নরেশচন্দ্র বড় চতুর বাড়িঅলা। ভাড়াটে ওঠানোর দরকার পড়লেই সে অন্য কোনও বখেড়ায় না। গিয়ে বউ শোভারানিকে টুইয়ে দেয়। শোভার মুখ হল আঁস্তাকুড়। সে তখন সেই ভাড়াটের উদ্দেশে আঁস্তাকুড়ের ঢাকনা খুলে আবর্জনা ঢালতে শুরু করে। সেবাক্য যে শোনে তার কান দিয়ে তপ্ত সিসে ঢালার চেয়েও বেশি কষ্ট হয়। সে বাক্য শুনলে গতজন্মের পাপ কেটে যায় বুঝি। শোভারানি অবশ্য এমনি এমনি গাল পাড়ে না। নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরদোরে আপনজনের মতো যাতায়াত শুরু করে, বাটি বাটি রান্না করা খাবার

পাঠায়, দায়ে-দফায় গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। ওইভাবেই তাদের সংসারের হাল-চাল, গুপ্ত খবর সব বের করে আনে। কোন সংসারে না। দুটো-চারটে গোপন ব্যাপার আছে। সেই সব খবরই গুপ্ত অস্ত্রের মতো শোভার ভাঁড়ারে মজুত থাকে। দরকার মতো কিছু রং-পালিশ করে এবং আরও কিছু বানানো কথা, যোগ করে শোভা দিনরাত চেঁচায়। ভাড়াটে পালানোর পথ পায় না। গগনও শোভার দম দেখে অবাক হয়ে বলে, এ তো হামিদা বানুর চেয়ে বেশি কলজের জোর দেখতে পাই।

একমাত্র গগনেরই কিছু তেমন জানে না শোভা। না জানলেও আটকায় না। যেদিন নরেশকে ঝাঁকি দিয়েছিল গগন, সেদিন শোভারানি একনাগাড়ে ঘন্টা আষ্টেক গগনের তাবৎ পরিবারের শ্রাদ্ধ করেছিল। বেশ্যার ছেলে থেকে শুরু করে যত রকম বলা যায়। গগন গায়ে মাখেনি, তবে ক্লাবের ছেলেরা পরদিন সকালে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। ব্রজ দত্ত নামে সবচেয়ে মারকুট্টা যে চেলা আছে। গগনের দোতলায় উঠে নরেশকে ডেকে শাসিয়ে দিয়ে যায়। মারত, কিন্তু গগন ওরকমধারা দুর্বলের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না বলে মারেনি। তাতে শোভারানির মুখে কুলুপ পড়ে যায়। কিন্তু রাগটা তো আর যায়নি। বিশেষত গগন তখনও ইচ্ছেমতো জল তোলে, কলে কোনও দিন জল না এলে নরেশের চাকরকে ডেকে ওপরতলা থেকে বালতি বালতি জল আনিয়ে নেয়। শোভা রাগ করে হয়তো, কিন্তু জল দিয়ে দেয়। ঝামেলা করে না।

ভেবে দেখলে গগন কিছু খারাপ নেই। কেবল ওই বর্ষাকালটাকেই যা তার ভয়।

লাশটার কথা ভাবছি, বুঝলে গগন!

কী ভাবছ?

এখনও নেয়নি। গন্ধ ছাড়বে।

নেবে'খন। সময় হলে ঠিক নেবে।

ছেলেটা এখানকার নয় বোধহয়। সারাদিনে কম করে দুচারশো তোক দেখে গেছে, কেউ চিনতে পারছে না।

এসেছিল বোধহয় অন্য কোথা থেকে। ক্যানিং ট্যানিং-এর ওদিককার হতে পারে।

সুরেন মাথা নেড়ে বলল, বেশ ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। কসরত করা চেহারা।

গগন একটু কৌতূহলী হয়ে বলে, ভাল শরীর?

বেশ ভাল। তৈরি।

আহা! বলে শ্বাস ছেড়ে গগন বলে, অমন শরীর নষ্ট করল?

সুরেন খাঁড়া বলে, তাও তো এখনও চোখে দেখোনি, আহা-উঁহু করতে লাগলে।

ও সব চোখে দেখা আমার সহ্য হয় না। অপঘাত দেখলেই মাথা বিগড়ে যায়। গত মাঘ মাসে চেতলার দিদিমাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি রাজ্যের কলেজের মেয়ে হাতে বই-খাতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সব মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে, একটা খাট ঘিরে ভিড়, শুনলাম কলেজের প্রথম বছরের মেয়ে একটা। সে দেওয়ালির দিন সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি পরে বেরোতে যাচ্ছিল, আগুন লেগে তলার দিকটা পুড়ে যায়। ওইসব সিন্থেটিক কাপড়ও খুব ডেঞ্জারাস, বুঝলে সুরেন? ওতে আগুন লাগলে তেমন দাউ দাউ করে জ্বলবে না, কিন্তু ফাইবার গলে গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে যাবে, কেউ খুলতে পারবে না। মেয়েটারও তাই হয়েছিল, কয়েক মাস হাসপাতালে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। ভিড়-টিড় ডিঙিয়ে উঁকি মেরে দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো একটু শুকনো বটে, কিন্তু কী মরি মরি রূপ, কচি, ফরসা! ঢল ঢল করছে মুখখানা। বুকের মধ্যে কেমন যে করে উঠল!

সুরেন খাঁড়া বলে, ও রকম কত মরছে রোজ।

গগনচাঁদ ব্যাপারটা কত'র মধ্যে ফেলতে চায় না, বলল, না হে, এ মেয়েটাকে সকলের সঙ্গে এক করবে না। কী বলব তোমাকে, বললে পাপ হবে কি না তাও জানি না, সেই মরা মেয়েটাকে দেখে আমার বুকে ভালবাসা জেগে উঠল। ভাবলাম, ও যদি এক্ষুনি বেঁচে ওঠে তো ওকে বিয়ে করি। সেই ছেলেবেলা থেকে অপঘাতে মৃত্যুর ওপর আমার বড় রাগ। কেন যে মানুষ অপঘাতে মরে!

সুরেন রুমালে ঘাড় গলা ঘষতে ঘষতে বলে, তোমার শরীরটাই হোতকা, মন বড্ড নরম। মনটা আর একটু শক্ত না করলে কি টিকতে পারবে? চারদিকের এত অপঘাত, মৃত্যু, অভাব- এ সব সইতে হবে না?

গগনচাঁদ একটু থমকে গিয়ে বলে, তোমাদের এক-এক সময়ে এক-এক রকমের কথা। কখনও বলছ গগনের মন নরম, কখনও বলছ গগনের মেজাজটা বড় গরম। ঠিক ঠিক ঠাওর পাও না নাকি!

সুরেন বলে, সে তত্ত্ব এখন থাক, আমি লাশটার কথা ভাবছি।

ভাবছ কেন?

ভাবছি ছেলেটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে কসরত করত। তুমি তো ব্যায়াম শেখাও, তা তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কি না তা গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি!

গগন ঝোল নামিয়ে এক ফুয়ে জনতা স্টোভ নিভিয়ে দিল। বলল, ও, তাই আগমন হয়েছে!

তাই।

কিন্তু ভাই, ও সব দেখলে আমার রাতের খাওয়া হবে না।

খেয়ে নিয়েই চল, আমি ততক্ষণ বসি।

গগন মাথা নেড়ে বলে, তা-ও হয় না, খাওয়ার পর ও সব দেখলে আমার বমি হয়ে যেতে পারে।

সুরেন বলে, তুমি আচ্ছা লোক হে! বলছি তো তেমন ঘেন্নায় দৃশ্য কিছু নয়, কাটা-ফাটা নেই, এক চামচে রক্তও দেখলাম না কোথাও। তেমন বীভৎস কিছু হলে না হয় কথা ছিল।

গগনের চেহারায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর শান্ত দৃঢ় ভাবটা থাকে সেটা এখন আর রইল না। হঠাৎ সে ঘামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল, কার না কার বেওয়ারিশ লাশ! তোমার তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন? ছেড়ে দাও, পুলিশ যা করার করবে।

সুরেন ভ্রু কুঁচকে গগনকে একটু দেখল। বলল, সে তো মুখও জানে। কিন্তু কথা হল, আমাদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটে গেল। অনেকের সন্দেহ, খুন। তা সে যা-ই হোক, ছেলেটাকে চেন গেলে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিশ কত কী করবে তা তো জানি!

সুরেন এ অঞ্চলের প্রধান। গগন তা জানে। সে নিজে এখানে পাঁচ-সাত বছর আছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন কিছু নয়। এক গোটা পাঁচেক জিমনাশিয়ামের কিছু ব্যায়ামের শিক্ষানবিশ আর স্থানীয় কয়েকজন তার পরিচিত লোক। সুরেনের মতো সে এখানকার শিকড়-গাড়া লোক নয়। সুরেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালই, কিন্তু এও জানে, সুরেনের মতে মত না দিয়ে চললে বিস্তর ঝামেলা। সুরেনের টাকার জোর আছে, দলের জোর আছে, নিজেকে সে এ অঞ্চলের রাজা ভাবে। বিপদ সেখানেই, এ অঞ্চলে যা ঘটে সব তার নিজের দায় বলে মনে করে সুরেন। খেপে গেলে সে অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

গগন প্যান্ট পরল, জামা গায়ে গলিয়ে নিল। চপ্পলজোড়া পায়ে দিয়ে বলল, চলো।

খেলে না?

না। যদি রুচি থাকে তো এসেই যা হোক দুটো মুখে দেব। নইলে আজ আর খাওয়া হল না।

২. বেড়ালকে ফাঁসি

গতবার সন্তু একটা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। বেড়ালটা অবশ্য খুবই চোর ছিল, ছিনতাই করত, মাঝে মাঝে দু-একটা ডাকাতিও করেছে। যেমন সন্তুর ছোট বোন দুধ খেতে পারে না, রোজ সকালে মারধরের ভয় দেখিয়ে দুধের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, আর তখন খুব অনিচ্ছায় সন্তুর বোন টুটু এক চুমুক করে খায় আর দশ মিনিট ধরে আগডুম বাগড়ম বকে, খেলে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই করতে করতে এক ঘণ্টা। ততক্ষণে দুধ ঠান্ডা মেরে যায়, মাছি পড়ে। বেড়ালটা এ সবই জেনে তক্কে তক্কে থাকত। এক সময়ে দেখা যেত, প্রায় সকালেই সে গেলাস কাত করে মেঝেময় দুধ ছড়িয়ে চেটেপুটে খেয়ে গেছে। এটা চুরি। এ রকম চুরি সে হামেশাই করত, আর ছিনতাই করত। আরও কৌশলে। পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ার সময়টা কী করে যে তার জানা থাকত কে বলবে! ঠিকঠাক খাওয়ার সময়ে হাজির থাকত সে। মুখোমুখি বসে চোখ বুজে ঘুমোনোর ভান করত, আর। সুযোগ হলেই এর হাত থেকে, তার পাত থেকে মাছের টুকরো কেড়ে নিয়ে হাওয়া। ডাকাতি করত। মা-মাসিদের ওপর। কেউ মাছ কুটছে, গয়লার কাছ থেকে দুধ নিচ্ছে, কি হরিণঘাটার বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছে, অমনি হুড়ুশ করে কোত্থেকে এসে বাঘের মাসি ঠিক বাঘের মতোই অ্যাও করে উঠত। দেখা গেছে মা-মাসির হাত থেকে মাছ কেড়ে নিতে তার বাধেনি, দুধের ডেকচিও সে ওলটাতে জানত মা-মাসির হাতের নাগালে গিয়ে। ও রকম বাঁদর বিড়াল আর একটাও ছিল না। বিশাল সেই হুলোটা অবশ্য পরিপাটি সঁতে নখে ইদরও মেরেছে অনেক। সিংহবাড়ির ছন্নছাড়া বাগানটার একাধিক হেলে আর জাতি সাপ তার হাতে প্রাণ দিয়ে শহিদ হয়েছে। গায়ে ছিল অনেক আঁচড়-কামড়ের দাগ, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে প্রায়দিনই তার হাতাহাতি কামড়াকামড়ি ছিল। কুকুররাও, কে জানে কেন, সমঝে চলত তাকে। রাস্তা-ঘাটে বেড়াল দেখলেই যেমন কুকুর হামলা করে, তেমন এই হুলোকে কেউ করত না। কে যেন বোধহয় রায়েদের বুড়ি মা-ই হবে, বেড়ালটার নাম

দিয়েছিল গুন্ডা। সেই নামই হয়ে গেল। হুলো গুন্ডা এ পাড়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াত, ঢিল খেতে, গাল তো খেতই।

সন্তুকে দু-একটা স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় যে স্কুলে সে পড়ত তা ছিল সাহেবি স্কুল, খুব আদব-কায়দা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। সেখানে ভরতি হওয়ার কিছু পরেই সন্তুর বাবা অধ্যাপক নানক চৌধুরীকে ডেকে স্কুলের রেকটর জানালেন, আপনার ছেলে মেন্টালি ডিরেঞ্জড। আপনারা ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমরা আর দুমাস ট্রায়ালে রাখব, যদি ওর উন্নতি না হয় তো দুঃখের সঙ্গে টিসি দিতে বাধ্য হব।

নানক চৌধুরী আকাশ থেকে পড়লেন। আবার পড়লেনও না। কারণ তার মনে বরাবরই একটা খটকা ছিল সন্তু সম্পর্কে। বয়সের তুলনায় সন্তু ছিল বেশি নিষ্ঠুর, কখনও কখনও মার খেলে হেসে ফেলে। এবং এমন সব দুষ্টুমি করে যার কোনও মানে হয় না। যেমন সে ছাদের আলসের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলের ভারী টবের একটা-দুটো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে নীচের রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। রাস্তায় হাজার লোক চলে। একবার একটা সন্তুর বয়সি ছেলেরই মাথায় একটা টব পড়ল। সে ছেলেটা দীর্ঘ দিন হাসপাতালে থেকে যখন ছাড়া পেল তখন বোধবুদ্ধিহীন জরাব হয়ে গেছে। যেমন সে একবার সেফটিপিন দিয়ে টিয়াপাখির একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল। টিয়ার চিৎকারে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, একটা চোখ থেকে অবিরল রক্ত পড়ছে লাল অশ্রুর মতো। আর পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে। সে কী অমানুষিক চিৎকার! খাঁচার গায়েই সেফটিপিনটা আটকে ছিল। আর একবার সে তার ছোট বোনকে বারান্দার এক ধারে দাঁড় করিয়ে জোরে গুলতি মারে। মরেই যেত মেয়েটা। বুকে লেগে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান। হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েকে ভাল করে আনতে হয়। তাই নানক চৌধুরী অবাক হলেও সামলে গেলেন। তবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না-গিয়ে সন্তুকে বাড়ি ফিরে একনাগাড়ে মিনিট পনেরো ধরে প্রচণ্ড মারলেন।

দুমাস পর ঠিক কথামতোই টিসি দিয়ে দিল স্কুল। দ্বিতীয় স্কুলটি অত ভাল নয়। কিন্তু সেখানেও কিছু ডিসিপ্লিন ছিল, ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখা হত। দুমাস পর সেখান থেকে চিঠি এল আপনার ছেলে পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল, তার জন্য আর পাঁচটা ছেলে নষ্ট হচ্ছে।

এক বছর বাদে সন্তু সেকেন্ড হয়ে ক্লাসে উঠল। কিন্তু প্রমোশনের সঙ্গে তাকে টিসি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অগত্যা পাড়ার কাছাকাছি একটা গোয়ালমার্কা স্কুলে ছেলেকে ভরতি করে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন নানক চৌধুরী। এই স্কুলে দুষ্টু ছেলের দঙ্গল, তার ওপর গরিব স্কুল বলে কাউকে সহজে তাড়িয়ে দেয় না। বিশেষত সন্তুর বেতন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে, এবং ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। নানক চৌধুরীকে এখন সত্যুর ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হয় না, তিনি নিজের লেখাপড়ায় মগ্ন থাকেন।

সন্তু ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলের ফুটবল টিমে সে অপরিহার্য খেলোয়াড়। তা ছাড়া সে একটা। ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শেখে। গগনচাঁদ শেখায়। সন্তুর খুব ইচ্ছে সে ইনমেন্ট নিয়ে ব্যায়াম করে। তাতে শরীরের পেশি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু গগন যন্ত্র ছুঁতেই দেয় না, বলে, ও সব করলে শরীর পাকিয়ে শক্ত জিংড়ে মেরে যাবে, বাড়বে না। গগন তাই ফ্রি হ্যান্ড করায় আর রাজ্যের যোগব্যায়াম, ব্রিদিং, স্কিপিং আর দৌড়। সন্তু অবশ্য সে কথা শোনে না। ফাঁক পেলেই রিং করে, প্যারালাল বার-এ ওঠে, ওজন তোলে, স্প্রিং টানে। গগন দেখলে ঝাঁপড় মারবে, কিংবা বকবে। তাই প্রায় সময়েই রাতের দিকে জিমনাশিয়ামে যখন গগন থাকে না, দু-চারজন চাকুরে ব্যায়ামবীর এসে কসরত করে আর নিজের চেহারা আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, তখন সন্তু এসে যন্ত্রপাতি নেড়ে ব্যায়াম করে।

গুন্ডা বেড়ালটাকে গতবার সন্তু ধরেছিল সিংহদের বাগানে। বাগান বলতে আর কিছু নেই। কোমর-সমান উঁচু আগাছায় ভরে গেছে চারধার। একটা পাথরের ফোয়ারা ভেঙে ফেটে

কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা পামগাছের গায়ে বহু দূর পর্যন্ত লতা উঠেছে বেয়ে। সিংহীদের বাড়িতে কেউই থাকে না। বছর দেড়েক আগে বুড়ো নীলমাধব সিং মারা গেলেন। হাড়কিপটে লোক ছিলেন। অত বড় বাড়ির মালিক, তবু থাকতেন ঠিক চাকরবাকরের মতো, হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা, পায়ে রবারের চটি। একটা চাকর ছিল, সে-ই দেখাশোনা করত। নীলমাধবের একমাত্র ছেলে বিলেতে থাকে, আর কেউ নেই। অসুখ হলে লোকটা ডাক্তার ডাকতেন না, নিজেই হোমিয়োপ্যাথির বাক্স নিয়ে বসতেন। বাজার করতেন নিজের হাতে। যত সস্তা জিনিস এনে রান্না করে খেতেন। বাগানে কাশীর পেয়ারা, সফেদা, আঁশফল বা জামরুল পাড়তে বাচ্চা-কাচ্চা কেউ ঢুকলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। একটা সড়ালে কুকুর ছিল, ভারী তেজি, সেটাকেও লেলিয়ে দিতেন। ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করতেন বসে বসে। একটা বুড়ো হরিণ ছিল, সেটা বাগানে দড়িবাঁধা হয়ে চরে। বেড়াত। নীলমাধব পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না তবে তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে খুশি হতেন, অনেক পুরনো দিনের গল্প ফেঁদে বসতেন। এ অবশ্য নীলমাধবের পৈতৃক সম্পত্তি। নিঃসন্তান জ্যাঠা মারা গেলে দেখা যায় উইল করে তিনি নীলমাধবকেই সব দিয়ে গেছেন। লোকে বলে নীলমাধব এক তান্ত্রিকের সাহায্যে বাণ মেরে জ্যাঠাকে খুন করে সম্পত্তি পায়। লোকের ধারণা, নীলমাধব তার স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এ সবই অবশ্য গুজব, কোনও প্রমাণ নেই। তবে কথা চলে আসছে।

সন্তু একবার নীলমাধবের হাতে ধরা পড়েছিল। সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

চিরকালই জীবন্ত কোনও কিছু দেখলেই তাকে উত্ত্যক্ত করা সন্তুর স্বভাব, সে মানুষ বা জন্তু যা-ই হোক। তাদের একটা চাকর ছিল মহী। লোকটা চোখে বড় কম দেখত। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই সন্তু তাকে বরাবর-মহীদা, গাড়ি আসছে...এই বলে হাত ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিত। এবং মহী কয়েক বারই এভাবে বিপদে পড়েছে। সন্তু তাকে বার দুই নালার মধ্যেও ফেলে দেয়। এ রকমই ছিল তার স্বভাব। তখন সিংহীদের বাগানের বুড়ো হরিণটাকে সে প্রায়ই ঢিল মারত, সিংহীদের বাগানের ঘর-দেয়াল অনেক

জায়গায় ভেঙে ফেটে গেছে। টপকানো সোজা। প্রায় দুপুরেই সন্তু দেয়াল টপকে আসত, বাগানে ঘুরত-টুরত, আর বাঁধা হরিণটাকে তাক করে গুলতি মারত। হরিণটার গায়ে চমৎকার কয়েকটা দাগ ছিল, সেই দাগগুলো লক্ষ্য করে গুলতি দিয়ে নিশানা অভ্যাস করত সে। আর তার লক্ষ্য ছিল, হরিণের কাজল-টানা চোখ। কখনও বা গাছের মতো দুটি প্রকাণ্ড শিংকেও লক্ষ্য করে ঢিল মারত সে। একবার হরিণটাকে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে বাগানের উত্তর দিকে একটা গহিন লতানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে দেয়।

সন্তু জানত না যে বুড়ো নীলমাধবের দূরবিন আছে। এবং প্রায়দিনই নীলমাধব দূরবিন দিয়ে তাকে খুঁজত। একটা দুষ্টু ছেলে যে হরিণকে ঢিল মারে সেটা তার জানা ছিল। প্রিয় হরিণের গায়ে তিনি দাগ খুঁজে পেতেন।

হরিণকে লতাগাছে আটকে দেওয়ার পরদিনই সন্তু ধরা পড়ে। সন্তু রোজকার মতোই দুপুরে বাগানে ঢুকেছে, পকেটে গুলতি, চোখে শ্যেনদৃষ্টি। চার দিক রোদে খাঁ খাঁ করছে সিংহীবাগান। হরিণ চরছে। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গের ভিড়। শিরিষ গাছে একটা মৌচাক বাঁধছে মৌমাছিরা। বর্ষা তখনও পুরোপুরি আসেনি। চারধারে একপশলা বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরম।

সফেদা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সন্তু ফল দেখছিল। খয়েরি রঙের কী ফল ফলেছে গাছে। ভারে নুয়ে আছে গাছ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এক থোপা ফল ধরেও ফেলেছিল সন্তু। সেই সময়ে পায়ের শব্দ পেল, আর খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক। তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তিন ধার থেকে তিনজন আসছে। এক দিক থেকে কুকুরটা, অন্য ধার থেকে চাকর, আর ঠিক সামনে একনলা বন্দুক হাতে নীলমাধব সিংহ। একটা লাফ দিয়ে সন্তু দৌড়েছিল। পারবে কেন? মস্ত সড়ালে কুকুরটাই তাকে পেল প্রথম। পায়ের ডিমে দাঁত বসিয়ে জতুটা ঘাসজঙ্গলে পেড়ে ফেলল তাকে। পা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কুকুরটা তার বুকের ওপর খাপ পেতে আধখানা শরীরের ভার দিয়ে চেপে রেখেছে। আর ধারালো ঘাসের টানে কেটে যাচ্ছে সন্তুর কানের চামড়া। ডলা ঘাসের

অদ্ভুত গন্ধ আসছেনাকে। বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নীলমাধব বললেন, ওঠো। চাকরটা এসে ঘাড় চেপে ধরল। সন্তু কোনও কথাই বলতে পারছিল না।

বুড়ো নীলমাধব নিয়ে গেলেন সেই বিশাল বাড়ির ভিতরে। সেইখানে অত ভয়ভীতির মধ্যেও ভারী লজ্জা পেয়েছিল সন্তু দেয়ালে দেয়ালে সব প্রকাণ্ড মেমসাহেবের ন্যাংটো ছবি, আর বড় বড় উঁচু টুলে ওইরকমই ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথরের মূর্তি দেখে।

সব শেষে একটা হলঘর। সেইখানে এনে দাঁড় করালেন নীলমাধব। মুখে কথা নেই। সিলিং থেকে একটা দড়ি টাঙানো, দড়ির নীচের দিকে ফাস, অন্য প্রান্তটা সিলিং-এর আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে কাছেই ঝুলছে।

নীলমাধব বললেন, তোমার ফাঁসি হবে।

এই বলে নীলমাধব দড়িটা টেনেটুনে দেখতে লাগলেন। চাকরটাকে বললেন একটা টুল আনতে। কুকুরটা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সন্তু বুঝল এইভাবেই ফাঁসি হয়। কিছু করার নেই।

গলায় সেই ফাস পরে টুলের ওপর ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকেছিল সন্তু। চোখের পাতা ফেলেনি। অন্য প্রান্তের দড়িটা ধরে থেকে সেই এক ঘণ্টা নীলমাধব বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাটা খুব খারাপ লাগেনি সন্তুর। নীলমাধবের পূর্বপুরুষ কীভাবে বাঘ ভালুক এবং মানুষ মারতেন তারই নানা কাহিনি! শেষ দিকটায় সন্তুর হাই উঠছিল। আর তাই দেখে নীলমাধব ভারী অবাক হয়েছিলেন।

যাই হোক, এক ঘন্টা পর নীলমাধব তাকে টুল থেকে নামিয়ে একটা চাবুক দিয়ে গোটা কয় সপাং সপাং মারলেন। বললেন, ফের যদি বাগানে দেখি তো পুঁতে রাখব মাটির নীচে।

এই ঘটনার পর নীলমাধব বেশিদিন বাঁচেননি। তার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা মারা যায়। সড়ালে কুকুরটাকে নিয়ে কেটে পড়ে চাকরটা। নীলমাধবের পেয়ারের হুলো বেড়ালটাই অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বড়লোকের বেড়াল বলেই কি না কে জানে, তার মেজাজ অন্য সব বেড়ালের চেয়ে অনেক কড়া ধাতের। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, গুন্ডামি কোনওটাই আটকাত না।

কে একজন রটাল, নীলমাধব মরে গিয়ে বেড়ালটায় ভর করে আছেন।

বিলেত থেকে কলকাঠি নেড়ে নীলমাধবের ছেলে কী করে যেন বাড়ি বিক্রি করে দিল। শোনা যাচ্ছে, এখানে শিগগির সব বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠবে।

তা সে উঠুক গে। গতবারের কথা বলে নিই আগে। হুলো গুড়া বেড়ালকে সিংহীদের বাগানে তক্কে তকে থেকে একদিন পাকড়াও করে সন্তু। ডাকাবুকো ছেলে। বেড়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে সেই বাড়িটায় ঢুকে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে ছাড়াবাড়ির জানালা টপকে ভিতরে ঢুকতেই ফাঁসির হলঘরে আসে। সিলিং থেকে দড়ি টাঙানোর সাধ্য নেই। সে চেষ্টাও করেনি সন্তু।

একটা মোটা ভারী চেয়ারে দড়িটা কপিকলের মতো লাগিয়ে বেড়ালটাকে অন্য প্রান্তে বেঁধে সে বলল, তোমার ফাঁসি হবে। বলেই দড়ি টেনে দিল।

এ সময়ে এক বজ্রগম্ভীর গলা বলল, না, হবে না।

চমকে উঠে চার দিকে তাকিয়ে দেখল সন্তু। হাতের দড়ি সেই ফাঁকে টেনে নিয়ে গলায় দড়ি সমেত গুন্ডা পালিয়ে যায়।

কাকে দেখেছিল সন্তু তা খুবই রহস্যময়। সন্তু কিছু মনে করতে পারে না। সে চমকে উঠে চার দিকে চেয়ে দেখছিল, এ সময় কে তাকে মাথার পিছন দিকে ভারী কোনও কিছু দিয়ে মারে। সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধের পর নানক চৌধুরী এক অচেনা লোকের টেলিফোন পেয়ে সিংহীদের বাড়িতে লোকজন নিয়ে গিয়ে সন্তুকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর দিন সাতেক সন্তু ব্রেন-ফিবারে ভোগে। তারপর ভাল হয়ে যায়। এবং এ ঘটনার পর গুল্ডাকেও এ লোকালয়ে আর দেখা যায়নি। একটা বেড়ালের কথা কে-ই বা মনে রাখে।

সন্তুর কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অলক্ষে তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে। সিংহদের বাড়িতে যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে বাস্তবিক তার শত্রু নাও হতে পারে। তার বাবা নানক চৌধুরী মানুষটা খুবই নির্বিকার প্রকৃতির লোক। ঘটনার পর নানক চৌধুরী থানা-পুলিশ করেনি। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছে। স্যুকেও তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। এমনকী কে একজন যে নিজের নাম গোপন রেখে টেলিফোন করেছিল তারও খোঁজ করবার চেষ্টা করেনি। নানক চৌধুরী লোকটা ওইরকমই, প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি আর নগদ টাকা আছে। বিবাহসূত্রে শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও সম্পত্তি পেয়েছে কারণ বড়লোক শ্বশুরের ছেলে ছিল না, মাত্র দুটি মেয়ে। কাজেই তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নানক চৌধুরীর শালি, অর্থাৎ সন্তুর মাসির ছেলেপুলে নেই। বয়স অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে তার সন্তান-সম্ভাবনা নেই। সেই শালি সন্তুকে দত্তক চেয়ে রেখেছে। সন্তুর মাসি যদি অন্য কাউকে দত্তক না নেয় তবে তার সম্পত্তিও হয়তো একদিন সন্তুই পাবে। মাসি স্যুকে বড় ভালবাসে। সন্তুও জানে একমাত্র মাসি ছাড়া তাকে আর কেউ নিখাদ ভালবাসে না। যেমন মা। মা কোনও দিন সন্তুর সঙ্গে তার বোনকে কোথাও বেড়াতে পাঠায় না বা একা খেলতে দেয় না। তার সন্দেহ, সন্তু ছোটবোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। বাবা সন্তুর প্রতি খুবই উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে পেটানো ছাড়া সন্তুর অস্তিত্বই। নেই তার কাছে। লোকটা সারা দিনই লেখাপড়া নিয়ে আছে। বই ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

সন্তুর সঙ্গী-সাথী প্রায় কেউই নেই। তার কারণ, প্রথমত সন্তু বন্ধুবান্ধব বেশি বরদাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে কাউকেই খুব একটা ভালবাসতে পারে না। তৃতীয়ত, সে

যে ধরনের দুষ্টুমি করে সে ধরনের দুষ্টুমি খুব খারাপ ছেলেরাও করতে সাহস পায় না। সন্তু তাই একা। দু-চারজন সঙ্গী তার কাছে আসে বটে, কিন্তু কেউই খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

কাল সন্ধেবেলা কিন্তু জিমনাশিয়াম থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, সেই সময়ে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুর বয়স বছর ষোলোর বেশি নয়। স্যদের ইস্কুলেই পড়ত, পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রিকশা চালায়। তবে রিকশা চালানো ছাড়া তার আরও কারবার আছে। স্টেশনে, বাজারে, লাইনের ধারে সে প্রায়ই চুরি-ছিনতাই করে। কখনও ক্যানিং বা বারুইপুর থেকে চাল নিয়ে এসে কালোবাজারে বেচে। এই বয়সেই সে মদ খায় এবং খুব হুল্লোড়বাজি করে। সন্তুর সঙ্গে তার খুব একটা খাতির কখনও ছিল না। কিন্তু দেখা হলে তারা দুজনে দুজনকে কী রে, কেমন আছিস রে বলে।

কাল কালু একটু অন্য রকম ছিল। সন্তু ওকে দূর থেকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই বুঝল, কালু মদ খেয়েছে। রিকশায় প্যাডল মেরে গান গাইতে গাইতে আসছে। চোখ দুটো চকচকে। সন্তুকে দেখেই রিকশা থামিয়ে বলল, উঠে পড়।

সন্তু ভ্রু কুঁচকে বলল, কোথায় যাব?

ওঠ না। তোকে একটা জিনিস দেখাব, এইমাত্র দেখে এলাম।

কৌতূহলী সন্তু উঠে পড়ল। কালু রিকশা ঘুরিয়ে পালবাজার পার হয়ে এক জায়গায় নিয়ে গেল তাকে। রিকশার বাতিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল, আয়।

তারপর খানিক দূর তারা নির্জনে পথহীন জমি ভেঙে রেল লাইনে উঠে এল। সেখানে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তার দাগ। আর-একটু দূরেই একটা ছেলে পড়ে আছে।

কালু বলল, এই মার্ডারটা আমার চোখের সামনে হয়েছে।

ছেলেটা কে?

চিনি না। তবে মার্ডারটা কে করেছে তা বলতে পারি।

কে?

কালু খুব ওস্তাদি হেসে বলল, যে পাঁচশো টাকা দেবে তাকে বলব। তোকে বলব কেন?

৩. সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ

সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ রেল লাইনের ওপর উঠে এল। এ জায়গাটা অন্ধকার। লোকজন এখন আর কেউ নেই। সুরেন খাঁড়া টর্চ জ্বেলে চারিদিকে ফেলে বলল, হল কী? এইখানেই তো ছিল!

গগনচাঁদ ঘামছিল। অপঘাতের মড়া দেখতে তার খুবই অনিচ্ছাবলতে কী রেলের উঁচু জমিটুকু সে প্রায় চোখ বুজেই পার হয়ে এসেছে। সুরেনের কথা শুনে চোখ খুলে বলল, নেই?

দেখছি না।

এই কথা বলতেই সামনের অন্ধকার থেকে কে একজন বলল, এই তো একটু আগেই ধাঙড়রা নিয়ে গেছে, পুলিশ এসেছিল।

সুরেন টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলল মুখের ওপর। লাইনের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করেছে কুলিরা। লাইন মেরামত হবে। সেই একটা গিটঠি পাথরের তূপের ওপর কালু বসে আছে।

সুরেন খাঁড়া বলে, তুই এখানে কী করছিস?

হাওয়া খাচ্ছি। কালু উদাস উত্তর দেয়।

কখন নিয়ে গেল?

একটু আগে। ঘণ্টা দুয়েক হবে।

পুলিশ কিছু বলল?–সুরেন জিজ্ঞেস করে।

ফের টচটা জ্বালতেই দেখা গেল, কালুর পা লম্বা হয়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এসেছে। ভূতের পায়ের মতো, খুব রোগা পা। আর পায়ের পাতার কাছেই একটা দিশি মদের বোতল আর শালপাতার ঠোঙা।

কালু একটু নড়ে উঠে বলে, পুলিশ কিছু বলেনি। পুলিশ কখনও কিছু বলে না। কিন্তু আমি সব জানি।

কী জানিস?

কালু মাতাল গলায় একটু হেসে বলে, সব জানি।

সুরেন খাঁড়া একটু হেসে বলে, হাওয়া খাচ্ছিস, না আর কিছু?

কালু তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে, যা পাই খেয়ে দিই। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই আরাম। জায়গাটা ভরাট রাখা নিয়ে হচ্ছে কথা।

ই, মস্ত ফিলজফার!

কালু ফের মাতাল গলায় হাসে।

পুলিশকে তুই কিছু বলেছিস?–সুরেন জিজ্ঞেস করে।

না। আমাকে কিছু তো জিজ্ঞেস করেনি। বলতে যাব কোন দুঃখে?

জিজ্ঞেস করলে কী বলতিস?

কী জানি?

শালা মাতাল!– সরেন বলে।

মাথা নেড়ে কালু বলে, জাতে মাতাল হলে কী হয়, তালে ঠিক আছে সব। সব জানি।

ছেলেটা কে জানিস?

আগে জানতাম না। একটু আগে জানতে পারলাম।

কে?

বলব কেন? যে ছেলেটাকে খুন করেছে তাকেও জানি।

খুন!- একটু অবাক হয় সুরেন, খুন কী রে? সবাই বলছে রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মরেছে!

মাথা নেড়ে কালু বলে, সন্ধের আগে এইখানে খুন হয়। আমি নিজে চোখে দেখেছি। মাথায় প্রথমে ডান্ডা মারে, তখন ছেলেটা পড়ে যায়। তারপর গলায় কাপড় জড়িয়ে গলা টিপে মারে। আমি দেখেছি।

কে মারল?

বলব কেন? পাঁচশো টাকা পেলে বলব।

পুলিশ যখন ধরে নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে কথা বার করবে তখন কী করবি?

বলব না। যে খুন করেছে সে পাঁচশো টাকা দেয় তো কিছুতেই বলব না।

ঠিক জানিস তুই?

জানাজানি কী! দেখেছি।

বলবি না?

না।

গগনচাঁদ এতক্ষণ কথা বলেনি। এইখানে একটা মৃত্যু ঘটেছে, এই ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল, খুনের খবর চেপে রাখিস না। তোর বিপদ হবে।

আমার বিপদ আবার কী! আমি তো কিছু করিনি। কালু বলল।

দেখেছিস তো সুরেন খাঁড়া বলে।

দেখলে কী?

দেখলে বলে দিতে হয়। খুনের খবর চাপতে নেই। সুরেন নরম সুরে বলে।

কালু একটা হাই তুলে বলে, তা হলে দেখিনি।

শালা মাতাল!–সুরেন হেসে গগনচাঁদের দিকে তাকায়।

কালু একটু কর্কশ স্বরে বলে, বারবার মাতাল বলবেন না। সব শালাই মাল টানে আপনিও টানেন।

সুরেন একটা অস্ফুট শব্দ করল। ইদানীং সে বড় একটা হাঙ্গামা-হুঁজ্জত করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ গগনচাঁদ বাধা দেওয়ার আগেই অন্ধকারে দশাসই শরীরটা নিয়ে দুই লাফে এগিয়ে গেল। আলগা নুড়ি পাথর খসে গেল পায়ের তলায়। ঠাস করে একটা প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। কাল এক বার আউ করে চেঁচিয়ে চুপ করে গেল। আলগা পাথরে পা হড়কে সুরেন পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কালুকে দেখা যাচ্ছিল না তবে সে-ও পড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। এই সময়ে কাছেই একটা বাজ ফেটে পড়ল। বাতাস এল এলোমলো। বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় করে পড়ছে।

সুরেন টর্চটা জ্বালতে গিয়ে দেখে, আলো জ্বলছে না। একটা কাতর শব্দ আসে পাথরের স্তূপের ওধার থেকে। সুরেন একটা মাঝারি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। বলে, শালা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

কাতর শব্দটা থেমে যায়।

গগনচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ পায় সে। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। খুব দুর্যোগ আসবে। গ্যারাজঘরের অবস্থাটা কী হবে, ভাবছিল সে। বৃষ্টিতে তার বড় বিপদ।

সুরেন দাঁড়িয়ে নিজের ডান হাতের কনুইটা টিপে টিপে অনুভব করছে। বলে, শালা জোর লেগেছে। রক্ত পড়ছে।

আবার বিদ্যুৎ চমকায়। আবার। গগনচাঁদ দেখতে পায়, কাল লাইনের ধারে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা রেল লাইনের ওপরে পাতা। মুহুর্মুহু গাড়ি যায়। যে-কোনও মুহূর্তে ওর ডান হাতটা দু ফালা করে বেরিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই খুব ক্ষীণ হলুদ একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর। বহু দূরে অন্ধকারের কপালে টিপের মতো একটা গোল হলুদ আলো স্থির হয়ে আছে। গাড়ি আসছে।

গগনচাঁদ কিছু ধীর-স্থির। টপ করে কোনও কাজ করে ফেলতে পারে না। সময় লাগে। এমনকী ভানা-চিন্তাতেও সে বড় ধীর। কখন কী করতে হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে।

তাই সে গাড়ির আলো দেখল, কালুর কথা ভাবল, কী করতে হবে তাও ভাবল! এভাবে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় কাটিয়ে সে ধীরেসুস্থে পাথরের কূপটা পার হয়ে এল। গাড়িটা আর খুব দূরে নেই। সে নিচু হয়ে পাজাকোলা করে কালুকে সরিয়ে আনল লাইন থেকে খানিকটা দূরে। একটা পায়ে-হটা রাস্তা গেছে লাইন ঘেঁষে। এখানে ঘাসজমি কিছু পরিষ্কার। সেখানে শুইয়ে দিল। এবং টের পেল মুষলধারে বৃষ্টির তোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চার দিকে। সব অস্পষ্ট। তাপদগ্ধ মাটি ভিজে এক রকম তাপ উঠেও চার দিকে অন্ধকার করে দিচ্ছে।

সুরেন খাঁড়া বলল, ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। চলো।

গগনচাঁদ কালুর বুক দেখল। এত বৃষ্টিতে বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় না। নাড়ি দেখল। নাড়ি চালু আছে।

গগনচাঁদ বৃষ্টির শব্দের ওপর গলা তুলে বলল, ওস্তান নেই। এ অবস্থায় ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

প্রায় নিঃশব্দে বৈদ্যুতিক ট্রেনটা এল। চলে গেল। আবার দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। সরেনের খেয়াল হল, গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়ে গেল। কালর হাতটা ছিল আপ লাইনের ওপর। এ গাড়িটায় কালুর হাত কাটা যেত না।

সুরেনের গলায় এখনও রাগ। বলল, পড়ে থাক। অনেক দিন শালার খুব বাড় দেখছি। চলো, কাকভেজা হয়ে গেলাম।

গগনচাঁদ দেখল, বৃষ্টির জল পড়ায় কালু নড়াচড়া করছে। গগন তার পাশে হাটু গেড়ে বসে বলে, তুমি যাও, স্টেশনের শেডের তলায় দাঁড়াও গিয়ে। আমি আর-একটু দেখে যাচ্ছি।

মাটি খুঁড়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে যাচ্ছে এত তোড়। কোনও মানুষই দাঁড়াতে পারে না। চামড়া ফেটে যায়। সুরেন একটা বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, দেরি কোরো না।

বলে কোলকুঁজো হয়ে দৌড় মারল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় কালুর মাথার অন্ধকার কেটে গেছে। গগনচাঁদ অন্ধকারেই তাকে ঠাহর করে বগলের তলায় হাত দিয়ে তুলে বসাল। কালু বসে ফোপাচ্ছে।

গগন কালুর মুখ দেখতে পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া। গগন বলল, ওঠ!

কালু উঠল।

অল্প দূরেই একটা না-হওয়া বাড়ি! ভাড়া বাঁধা হয়েছে। একতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন দোতলা উঠছে। পিছল পথ বেয়ে কালুকে ধরে সেখানেই নিয়ে এল গগনচাঁদ।

গা মুছবার কিছু নেই। সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। গগন গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে মাথা আর মুখ মুছল। কালু উবু হয়ে বসে বমি করছে, একবার তাকিয়ে দেখল গগন। বমি করে নিজেই উঠে গিয়ে বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে কোষে ধরে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল।

তারপর ফের মেঝেয় বসে পড়ে বলল, শরীরে কি কিছু আছে নাকি! মাল খেয়ে আর গাঁজা টেনে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

গগনচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বলল, তোর রিকশা কোথায়?

সে আজ মাতু চালাচ্ছে। আমি ছুটি নিয়েছি আজকের দিনটা।

কেন?

মনে করেছিলাম আজ পাঁচশো টাকা পাব।

গগন চুপ করে থাকে। কালুটা বোকা। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

গগন বললে, যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এখানকার নয়?

কালু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেজা গায়ে বসে ছিল। প্রথমটায় উত্তর দিল না।

তারপর বলল, বিড়ি-টিড়ি আছে?

আমি তো খাই না।

কালু ট্যাক হাতড়ে বলল, আমার ছিল। কিন্তু সব ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে।

ভেজা বিড়ি বের করে কালু অন্ধকারেই টিপে দেখল, ম্যাচিস থেকে এক কোষ জল বেরোল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা অস্পষ্ট খিস্তি করে কালু বলে, সুরেন শালার খুব তেল হয়েছে গগনদা, জানলে?

গগন অন্ধকারে কালুর দিকে চাইল। তেল কালুরও হয়েছে। আজকাল সকলেরই খুব তেল।

গগন বলল, ছেলেটা কি এখানকার?

কোন ছেলেটা?

যে খুন হল?

সে-সব বলতে পারব না।

কেন?

বলা বারণ।-কালু উদাস গলায় বলে।

গগনচাঁদ একটু চুপ করে থেকে একটা মিথ্যে কথা বলল, শোন একটু আগে সুরেন যখন তোকে মেরেছিল, তখন তুই অজ্ঞান হয়ে গেলি। তোর ডান হাতটা রেল লাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময় গাড়ি আসছিল। আমি তোকে সরিয়ে না আনলে ঠিক তোর হাতটা চলে যেত আজ।

কালু নড়ল না। কেবল বলল, মাইরি।

তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

কালু হঠাৎ আবার উদাস হয়ে গিয়ে বলল, তাতে কী হয়েছে? তুমি না সরালে একটা হাত চলে যেত! তা যেত তো যেত। এক-আধটা হাত-পা গেলেই কী থাকলেই কী!

গগনচাঁদ একটা রাগ চেপে গিয়ে বলল, দুর ব্যাটা, হাতকাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতিস তা হলে। রিকশা চালাত কে?

চালাতাম না। ভিক্ষে করে খেতাম। ভিক্ষেই ভাল, জানলে গগনদা। তোমাদের এলাকার রাস্তাঘাট যা তাতে রিকশা টানতে জান বেরিয়ে যায়। পোষায় না। শরীরেও কিছু নেই।

কথাটা বলবি না তা হলে?

কালু একটু চুপ করে থেকে বলল, পাঁচটা টাকা দাও।

গগন একটু অবাক হয়ে বলে, টাকা। টাকা কেন?

নইলে বলব না।

গগন একটু হেসে বলে, খুব টাকা চিনেছিস। কিন্তু এটা এমন কিছু খবর নয় রে। পুলিশের কাছে গেলেই জানা যায়।

তাই যাও না।

গগনেরও ইচ্ছে হয় এগিয়ে গিয়ে কালুর গলাটা টিপে ধরে। সুরেন যে ওকে মেরেছে সে কথা মনে করে গগন খুশিই হল। বলল, টাকা অত সস্তা নয়।

অনেকের কাছে সস্তা।

গগন মাথা নেড়ে বলে, তা বটে। কিন্তু আমার টাকা দামি।

কালু কাধ ঝাঁকিয়ে বলে, দিয়ো না।

গগন একটু ভেবে বলে, কিন্তু যদি পুলিশকে বলে দিই?

কী বলবে?

বলব খুনটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস।

বলো গে না, কে আটকাচ্ছে?

পুলিশ নিয়ে গিয়ে তোকে বাঁশডলা দেবে!

দিক।-কালু নির্বিকারভাবে বলে, এত ভয় দেখাচ্ছ কেন? যে মরেছে আর যে মেরেছে তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী? যে যার নিজের ধান্দায় কেটে পড়ো তো। কেবল তখন থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছ, তোমাদের এত খতেনে দরকার কী?

গগনচাঁদ ভেবে দেখল, সত্যিই তো। তার তো কিছু যায়-আসে না। কে কাকে খুন করেছে তাতে তার কী? সুরেন খাঁড়া এই ভরসন্ধ্যাবেলা তাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে না আনলে সে মড়া দেখতে আসতও না। যে মরল সে বিষয়ে একটা কৌতূহল ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। বিশেষত যখন শুনেছে যে মরা ছেলেটার শরীরটা কসরত করা। ভাল শরীরওয়ালা একটা ছেলে মরে গেছে শুনে মনটা খারাপ লাগে। কত কষ্টে এক-একটা শরীর বানাতে হয়। সেই আদরের শরীর কাটা-ছেঁড়া হয়ে যাবে! ভাবতে কেমন লাগে?

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনও অবিরল পড়ছে। আধখাচড়া বাড়িটার জানালা-দরজার পাল্লা বসেনি, ফাঁক-ফোকরগুলি দিয়ে জলকণা উড়ে আসছে। বাতাস বেজায়। শীত ধরিয়ে দিল। এধার-ওধার বিস্তর বালি, নুড়িপাথর ভূপহয়ে পড়ে আছে। কিছু লোহার শিকও। একটা লোক ছাতা মাথায়, টর্চ হাতে উঠে এল রাস্তা থেকে। ছাতা বন্ধ করে টর্চটা এক বার ঘুরিয়ে ফেলল গগনচাঁদের দিকে, অন্যবার কালুর দিকে। একহাতে বাজারের থলি। গলাখাঁকারি দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘরের

দরজায় টিনের অস্থায়ী কঁপ লাগানো। লোকটা ঝাপের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। চৌকিদার হবে।

কালু উঠে বলল, দেখি, লোকটার কাছে একটা বিড়ি পাই কি না, বড্ড শীত ধরিয়ে দিচ্ছে।

কালু গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বলল, সুরেন শালা জোর মেরেছে, জানলে গগনদা? চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে, বিড়ি টানতে টের পেলাম। বসে বসে খায় তো সুরেন, তাই গা-গতরে খাসি, আমাদের মতো রিকশা টানলে গতরে তেল জমতে পারত না।

গগন গম্ভীরভাবে বলে, হু।

হঠাৎ উবু হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে টানতেই বোধহয় কালুর মেজাজটা ভাল হয়ে গেল। বলল, যে ছেলেটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চেনো গগনদা!

গগন বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ভাবসাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। স্টেশনে সুরেন অপেক্ষা করছে। যাওয়া দরকার। কালুর কথা শুনে বলল, চিনি?

হু।

কে রে?

এক বান্ডিল বিড়ি কেনার পয়সা দেবে তো? আর একটা ম্যাচিস?

গগন হেসে বলে, খবরটার জন্য দেব না।

দিয়ো মাইরি। কালু মিনতি করে, আজকের রোজগারটা এমনিতেই গেছে। বিড়ি আর ম্যাচিসও গচ্চা গেল।

গগন বলল, দেব।

কালু বলল, আগে দাও।

গগন দিল।

কালু বলে, ছেলেটা বেগমের ছেলে।

বেগম কে?

তোমার বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের শালি। নষ্ট মেয়েছেলে, বাপুজি নগরে থাকে।

ও। বলে খানিকটা চমকে ওঠে গগন।

ছেলেটা তোমার আখড়ায় ব্যায়াম করত। সবাই ফলি বলে ডাকে। লোকে বলে, ও নাকি নরেশ মজুমদারেরই ছেলে।

জানি। এ সব কথা চাপা দেওয়ার জন্যই গগন তাড়াতাড়ি বলে, আর কী জানিস?

তেমন কিছু না। ছেলেটা বহুকাল হল পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। খুব পাজি বদমাশ ছেলে। ইদানীং ট্যাবলেট বেচতে আসত।

ট্যাবলেট! অবাক মানে গগন।

ট্যাবলেট, যা খেলে নেশা হয়। প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় খাওয়াত ছেলে-ছোকরাদের। তারপর নেশা জমে উঠলে পয়সা নিত। অনেককে নেশা ধরিয়েছে।

ড্রাগ নাকি?– গগন জিজ্ঞেস করে।

কী জানি কী! শুনেছি খুব সাংঘাতিক নেশা হয়।

গগন বলল, এ পাড়ায় যাতায়াত ছিল তো, ওকে কেউ চিনতে পারল না কেন?

কালু হেসে বলল, দিনমার্নে আসত না। রাতে আসত। তা ছাড়া অনেক দিন পাড়া ছেড়ে গেছে, কে আর মনে রাখে। আর চিনতে চায় কজন বলো! সবাই চিনি না চিনি না বলে এড়িয়ে যায়। ঝঞ্জাট তো।

নরেশ মজুমদার খবর করেনি?

কে জানে? জানলে আসত ঠিকই, নিজের সন্তান তো। বোধহয় খুব ভাল করে খবর পায়নি।

বৃষ্টি ধরে এল। এখনও টিপটিপিয়ে পড়ছে। এই টিপটিপানিটা সহজে থামবে না, লাগাতার চলবে। রাতের দিকে ফের কেঁপে আসবে হয়তো।

গগন গলা নামিয়ে বলল, সত্যিই খুন হতে দেখেছিস? না কি গুল ঝাড়ছিস?

কালু হাতের একটা ঝাঁপট মেরে বলে, শুধু শুধু গল্প ফেঁদে লাভ কী! আমার মাথায় অত গল্প খেলে না!

ছেলেটাকে তুই চিনলি কী করে?– গগন জিজ্ঞেস করে।

কোন ছেলেটাকে?

যে খুন হয়েছে, ফলি।

প্রথমটায় চিনতে পারিনি। এক কেতরে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, একটু চেনা-চেনা লাগছিল বটে। পুলিশ যখন ধাঙড় এনে বডি চিত করল তখনই চিনতে পারলাম। নামটা অবশ্য ধরতে পারিনি তখনও। পুলিশের একটা লোকই তখন বলল, এ তো ফলি, অ্যাবসকভার। তখন ঝড়াক করে সব মনে পড়ে গেল। ইদানীং নেশা-ভাং করে মাথাটাও গেছে আমার, সব মনে রাখতে পারি না।

গগন খুব ভেবে বলল, খুনের ব্যাপারটাও মনে না রাখলে ভাল করতিস। যে খুন করেছে সে যদি টের পায় যে তুই সাক্ষী আছিস, তা হলে তোকে ধরবে!

ধরুক না। তাই তো চাইছি! পাঁচ কানে কথাটা তুলেছি কেন জানো? যাতে খুনির কাছে খবর পৌঁছয়!

পৌঁছলে কী হবে?

পাঁচশো টাকা পাব, আর খবরটা চেপে যাব।

ব্ল্যাকমেল করবি কালু?

কালু হাই তুলে বলে, আমি অত ইংরিজি জানি না।

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে, সাবধানে থাকিস।

কালু বলল, ফলিকে তুমি চিনতে পারলে? গগন মাথা নেড়ে বলে, চিনেছি। আমার কাছে কিছুদিন ব্যায়াম শিখেছিল। লেগে থাকলে ভাল শরীর হত।

শরীর।-বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে কালু। বলে, শরীর দিয়ে কী হয় গগনা? অত বড় চেহারা নিয়েও তো কিছু করতে পারল না। এক ঘা ডাভা খেয়ে ঢলে পড়ল। তারপর গলা টিপে...ফুঃ!

গগন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। তার মাথার মধ্যে বেগম শব্দটা ঘুরছিল। শোভারানির বোন বেগম। খুব সুন্দর না হলেও বেগমের চেহারায় কী যেন একটা আছে যা পুরুষকে টানে। এখন বেগমের বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারা এখনও চমৎকার যুবতীর মতো। শোনা যায় স্বামী আছে। কিন্তু সেই স্বামী বড় হাবাগোবা মানুষ। কোন একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি করে। বেগম তাকে ট্যাকে গুঁজে রাখে। আসলে বেগমের যে একজন স্বামী আছে এ খোঁজই অনেকে পায় না। তার বাইরের

ঘরে অনেক ছোকরা ভদ্রলোক এসে সন্ধেবেলায় আড্ডা বসায়, তাসটাস খেলে, নেশার জিনিসও থাকে। লোকে বলে, ওইটেই বেগমের আসল ব্যাবসা। আড্ডার নলচে আড়াল করে সে ফুর্তির ব্যাবসা করে। তা বেগম থাকেও ভাল। দামি জামা কাপড়, মূল্যবান গৃহসজ্জা, চাকরবাকর, দাস-দাসী তো আছেই, ইদানীং একটা সেকেন্ডহ্যান্ড বিলিতি গাড়িও হয়েছে।

কয়েক বছর আগে নিঃসন্তান নরেশ আর শোভা বেগমের ছেলেকে পালবে পুষবে বলে নিয়ে আসে। বেগমও আপত্তি করেনি। তার যা ব্যবসা তাতে ছেলেপুলে কাছে থাকলে বড় ব্যাঘাত হয়। তাই ছোট্ট ফলিকে এনে তুলল নরেশ মজুমদার। লোকে বলাবলি করল যে, নরেশ আসলে নিজের জায়গা মতো নিয়ে এসেছে। হতেও পারে। বেগমের স্বামীর পৌরুষ সম্পর্কে কারওরই খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই।

ফলিকে এনে নরেশ ভাল ইস্কুলে ভরতি করে দেয়। ছেলেটার খেলাধুলোর প্রতি টান ছিল, তাই একদিন নরেশ তাকে গগনচাঁদের আখড়াতেও ভরতি করে দিল। কিছু ছেলে থাকে, যাদের শরীরের গঠনটাই চমৎকার। এ সব ছেলে অল্প কসরত করলেই শরীরের গুপ্ত এবং অপুষ্ট পেশিগুলি বেরিয়ে আসে। নিখুঁত শরীরের খুব অভাব দেশে। গগনচাঁদ তার ব্যায়ামের শিক্ষকতার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম মজবুত হাড় আর সুষম কাঠামোর শরীর পেল। এক নজর দেখেই গগনচাঁদ বলে দিয়েছিল, যদি খাটো তো তুমি একদিন মিস্টার ইউনিভার্স হবে।

তা হতও বোধহয় ফলি। কিছুকাল গগনচাঁদ তাকে যোগব্যায়াম আর ফ্রি-হ্যান্ড করায়। খুব ভোরে উঠে সে নিজে কেডস আর হাফপ্যান্ট পরে ফলিকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ত। পুরো চত্বরটা ঘুরে ঘুরে গায়ের ঘাম ঝরাত। তারপর ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আসন করাত। বিকেলে ফ্রি-হ্যান্ড। ফলি খানিকটা তৈরি হয়ে উঠতেই তাকে অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়েছিল গগন। খুব কড়া নজর রাখত, যাতে ফলির শরীরে কোনও পেশি শক্ত না হয়ে যায়। যাতে বাড় না বন্ধ হয়। ফলি নিজেও খাটত। আশ্চর্যের বিষয়, কসরত করা

ছেলেদের মাথা মোটা হয়, প্রায়ই বুদ্ধি বা। লেখাপড়ার দিকে খাকতি থাকে। মনটা হয় শরীরমুখী। ফলির সে রকম ছিল না। সে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। খরবুদ্ধি ছিল তার।

শোভারানি অবশ্য খুব সন্তুষ্ট ছিল না। প্রায়ই ওপরতলা থেকে তার গলা পাওয়া যেত, নরেশকে বকাবকি করছে, ওই গুন্ডাটার সঙ্গে থেকে ফলিটা গুন্ডা তৈরি হবে। কেন তুমি ওকে ওই গুন্ডার কাছে দিয়েছ?

ফলির শরীর সদ্য তৈরি হয়ে আসছিল। কত আর বয়স হবে তখন, বড়জোর ষোলো! বিশাল সুন্দর দেখনসই চেহারা নিয়ে পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াত তখন পাঁচজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত। আর সেইটেই ফলির কাল হল। সেই সময়ে সে পড়ল মেয়েছেলের পাল্লায়। প্রথমে গার্লস স্কুলের পথে একটি মেয়ে তাকে দেখে প্রেমে পড়ে। সেটার গর্দিশ কাটবার আগেই মুনশিবাড়ির বড় মেয়ে, যাকে স্বামী নেয় না, বয়সেও সে ফলির চেয়ে অন্তত চোদ্দো বছরের বড়, সেই মেয়েটা ফলিকে পটিয়ে নিল। সেখানেই শেষ নয়। এ বাড়ির ছোট বউ, সে বাড়ির ধুমসি মেয়ে, এ রকম ডজনখানেক মেয়েছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলি, মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই। সম্পর্কটা শারীরিক ছিল, কারণ অত মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে বস্তু থাকে না, প্রেম ইত্যাদি ভাবপ্রবণতার ব্যাপারকে ফকিকারি বলে মনে হয়।

গগনচাঁদ মেয়েছেলের ব্যাপারে কিছু বিরক্ত ছিল। সে নিজে মেয়েছেলের সঙ্গ পছন্দ করত না। মেয়েছেলে বড় নির্বোধ আর ঝগড়াটে জাত, এই ছিল গগনের ধারণা। এমন নয় যে তার কামবোধ বা মেয়েদের প্রতি লোভ নেই। সেসবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সারা দিন ধরে মেলামেশা এবং মেয়েশরীরের অতিরিক্ত সংস্পর্শ তার পছন্দ নয়। উপরন্তু তার কিছু নীতিবোধ এবং ধর্মভয়ও কাজ করে। প্রথমটায় যদিও ফলিকে এ নিয়ে কিছু বলেনি গগন। কিন্তু অবশেষে সেন্ট্রাল রোডের একটি কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর গগন আর থাকতে পারেনি। মেয়েটার দাদা আর এক প্রেমিক এ নিয়ে খুব তড়পায়। কিন্তু ফলিকে সরাসরি কিছু করার সাধ্য ছিল না। কারণ ফলির তখন একটা দল হয়েছে, উপরন্তু তার মাসি আর মেশোর টাকার জোর আছে। তাই সেই দাদা আর প্রেমিক দুজনে

এসে একদিন গগনকে ধরল। দাদার ইচ্ছে, ফলি মেয়েটিকে বিয়ে করে ঝামেলা মিটিয়ে দিক। আর প্রেমিকটির ইচ্ছে, ফলিকে আড়ংঘোলাই দেওয়া হোক বা খুন করা হোক বা পুলিশের হাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু গগন ফলির অভিভাবক নয়। সে ফলিকে শাসন করার ক্ষমতাও রাখে না! সে মাত্র ব্যায়াম-শিক্ষক। তবু ফলিকে ডেকে গগন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ফলির গগনের প্রতি কিছু আনুগত্য ও ভালবাসা ছিল তখনও। কারণ গগন বাস্তবিক ফলিকে ভালবাসত। আর ভালবাসা জিনিসটা কে না টের পায়! কিন্তু ফলিরও কিছু ছিল না। মেয়েছেলেরা তার জন্য পাগল হলে সে

কী-ই বা করতে পারে! যত মেয়ে তার সংস্পর্শে আসে সবাইকে তো একার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করাও কি ঠিক? এ সব কথা ফলি খোলসা করেই গগনকে বলেছিল।

গগন বুঝল এবং সে রাতারাতি ফলিকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ফলি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। তার ফলে শোভারানি গগনের শ্রাদ্ধ করল কিছুদিন। তার ধারণা, গগনই ফলিকে গুম করেছে। সেটা সত্যি না হলেও ফলির পালানোর পিছনে গগনের যে হাত ছিল তা মিথ্যে নয়। ফলি চলে যাওয়ায় পাড়া শান্ত হল। সেই কিশোরীটির পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিয়ে লোকলজ্জার ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল। যেসব মেয়ে বা মহিলা ফলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা কিছু মুষড়ে পড়ল। তবে অনেক স্বামী এবং অভিভাবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

ফলি কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে সে বেগম অর্থাৎ মায়ের আশ্রয়ে আর যায়নি। কে সেখানে গেলেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে লো েবলে যে বেগমের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলত।

কিন্তু গগন আজ এই ভেবেই খুব বিস্ময়বোধ করছিল যে, ফলির মতো বিখ্যাত ছেলের মৃতদেহ দেখেও কেন কেউ শনাক্ত করতে পারল না! ঠিক কথা যে, ফলি বহু দিন হল এ এলাকা ছেড়ে গেছে, তবু তাকে না চিনবার কথা নয়। বিশেষত সুরেন খাঁড়ার তো নয়ই।

রেল লাইন ধরে হেঁটে এসে গগনচাঁদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। প্ল্যাটফর্মটা এখন প্রায় ফাঁকা। বুকিং অফিসের সামনে ফলওয়ালা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন সিগারেট টানছে। গগন কিছু অবাক হল। সুরেন খাঁড়া বড় একটা ধূমপান করে না।

তাকে দেখেই সুরেন এগিয়ে এসে বলল, কী হল?

গগন কিছু বিস্মিতভাবেই বলে, তুমি ফলিকে চিনতে পারোনি?

ফলি। কোন ফলি? কার কথা বলছ?

যে ছেলেটা মারা গেছে। আমাদের নরেশ মজুমদারের শালির ছেলে।

সুরেন এ টু চুপ করে থেকে বলে, বেগমের সেই লুচ্চা ছেলেটা?

সেই। তোমার তো নো উচিত ছিল। তা ছাড়া তুমি যে বয়স বলেছিলে, ফলির বয়স তা নয়। কম করেও উনিশ কুড়ি বা কিছু বেশিই হতে পারে।

সুরেন গভীরভাবে বলল, চেনা কি সোজা? এই লম্বা চুল, মস্ত গোঁফ, মস্ত জুলপি, তা ছাড়া বহুকাল আগে দেখেছি, মনে ছিল না। তবে চেনা-চেনা ঠেকছিল বটে, তাই তো তোমাকে ধরে আনলাম। ও যে ফলি তা জানলে কী করে!

কালুর কাছ থেকে বের করলাম। বিড়ি-দেশলাইয়ের পয়সা দিতে হয়েছে।

সুরেন একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল, ব্যাটা বেঁচে আছে এখনও? থাপ্পড়টা তা হলে তেমন লাগেনি।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অত জোরে মারা তোমার উচিত হয়নি সুরেন। ওরা সব ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, জীনশক্তি কম, বেমক্কা লাগলে হার্টফেল করতে পারে।

রাখো রাখো। বোতল বোতল বাংলা মদ সাফ করে গাঁজা টেনে রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আমার থামড়ে মরবে? এত সোজা নাকি! ওদের বেড়ালের জান।

গগনচাঁদ হেসে বলে, তুমি নিজের থাপ্পড়ের ওজনটা জানো না। সে যাক গে, কালু মরেনি। এখন দিব্যি উঠে এসেছে।

ভাল। মরলে ক্ষতি ছিল না।

গগন শুনে হাসল।

দুজনে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে লাগল। কেউ কোনও কথা বলছে না।

৪. উঁকি মেরে

সন্তু একবার উঁকি মেরে তার বাবার ঘর দেখল। তার বাবা নানক চৌধুরী ইদানীং দাড়ি রাখছে। বড় পাগল লোক, কখন কী করে ঠিক নেই। এই হয়তো আধ হাত দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল হয়ে গেল। ফের একদিন গিয়ে দাড়ি কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে চলে এল। তবুনানক চৌধুরীকে নিয়ে কেউ বড় একটা হাসাহাসি করে না। সবাই সমঝে চলে। একে মহা পণ্ডিত লোক, তার ওপর রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ব্রজ দত্ত নামে মারকুট্টা ছেলেকেও একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল নানক চৌধুরী। কারণ ব্রজ দত্ত পাড়ার একটা পাগলা ল্যাংড়া লোককে ধরে মেরেছিল। সেই পাগলা আর ল্যাংড়া রমণী বোস নাকি বলে বেড়িয়েছিল যে ব্রজ দত্ত আর সাঙাতরা একরকম নেশা করে, তা মদের নয় কিন্তু মদের চেয়েও ঢের বেশি সাংঘাতিক।

সন্তু পরদা সরিয়ে উঁকি মেরে সাবধানে বাবাকে দেখে নেয়। ঘরটা অন্ধকার, কেবল টেবিল ল্যাম্পের ছোট্ট একটু আলো জ্বলছে, আর চৌধুরীর বড়সড় অন্ধকার ছায়ার শরীরটা ঝুঁকে আছে বইয়ের ওপর। পাড়ায় বোমা ফাটলেও নানক চৌধুরী এ সময়ে টের পায় না।

কালু আজ সন্তুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। কাল রাতে লাশ দেখে ফেরার পথে কালু বলেছিল, স্যু, খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ভয় খাই যদি শালা খুনেটা জানতে পারে যে আমি দেখেছি, তো আমাকেও ফুটিয়ে দেবে। তাই তোকে সব বলব, কাল সিংহীদের বাগানে রাত আটটায় থাকবি।

সন্তু বলল, কাল কেন? আজই বল না।

কালু মাথা নেড়ে বলে, আজ নয়। আমি আগে ভেবে-টেবে ঠিক করি, মাথাটা ঠান্ডা হোক। আজ মাথাটা গোলমাল লাগছে।

সন্তু বলল, কত টাকা পাবি বললি?

পাঁচশো। তাতে কদিন ফুর্তি করা যাবে। রিকশা টানতে টানতে গতর ব্যথা। পাঁচশো টাকা পেলে পালবাজারে সবজির দোকানও দিতে পারি।

সন্তু ব্ল্যাকমেল ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই পরামর্শ দিল, পাঁচশো কেন? তুই এক হাজারও চাইতে পারিস।

দেবে না।

দেবে। খুনের কেস হলে আরও বেশি চাওয়া যায়।

দুর!- কালু ঠোঁট উলটে বলে, বেশি লোভ করলেই বিপদ। আজকাল আকছার খুন হয়। কজনকে ধরছে পুলিশ! আমাদের আশেপাশে অনেক খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মতো। খুনের কেসকে লোকে ভয় পায় না।

সন্তু কাল রাতে ভাল ঘুমোয়নি। বলতে কী সেকাল থেকে একটু অন্য রকম বোধ প্রছে। খুন সেকখনও দেখেনি বটে, কিন্তু বইতে খুনের ঘটনা পড়ে আর সিনেমায় খুন দেখে সে ইদানীং খুনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে। তার ওপর যদি সেই খুনের ঘটনার গোপন তথ্যের সঙ্গে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে তবে তো কথাই নেই।

রাত আটটা বাজতে চলল। দেয়ালঘড়িতে এখন পৌনে আটটা। এ সময়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। নানক চৌধুরী, তার বাবা, যাকে সে আড়ালে নানকু বলে উল্লেখ করে, সে যদি পায় তো একতরফা হাত চালাবে। নাক চৌধুরী ব্যায়ামবীর বা ওভাষাকে ভয় পায় না, তা ছেলের গায়ে হাত তুলতে তার আসবে কেন?

তবু যেতেই হবে। সেই ভয়ংকর গুপ্ত খবরটা কালু তাকে দিয়ে যাবে আজ।

সন্তু রবারসোলের জুতো পরে আর একটা দুই সেল টর্চবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিংহীদের বাড়ির বাগান ভাল জায়গা নয়। পোড়ড়াবাড়ির মতো পড়ে আছে। সেখানে প্রচুর সাপখোপের আচ্ছা।

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আজ মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। কাজেই সন্তু পড়ার ঘরের বাতিটা জ্বেলে একটা বই খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। মা যদি আসে তো ভাববে ছেলে পড়তে পড়তে উঠে বাথরুমে বা ছাদে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সন্তু রাস্তা পার হয়ে খানিক দূরে চলে আসে। সিংহীদের পাচিলটা কোথাও কোথাও ভাঙা। একটা ভাঙা জায়গা পেয়ে সন্তু অনায়াসে পাচিল টপকে বাগানে ঢুকে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোয়। কালু এসে গেছে কি না দেখবার জন্য এধার-ওধার টর্চের আলো ফেলে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

শিরিষ গাছের তলায় এসে সন্তু দাঁড়ায়। দুবার মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে অপেক্ষা করে।, কালু এখনও আসেনি। বরং খবর পেয়ে মশারা আসতে শুরু করে ঝাঁক বেঁধে। হাঁটু, হাত, ঘাড় সব চুলকোনিতে জ্বালা ধরে যায়। সন্তু দুচারটে চড়চাপড় মেরে বসে গা চুলকোয়। কালু এখনও আসছে না।

চার দিক ভয়ংকর নির্জন আর নিস্তব্ধ। ওই প্রকাণ্ড পুরনো আর ভাঙা বাড়িটায় সন্তু ওকে ফাঁসি দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মরেছে সিংহবুড়ে। তার ওপর গতকাল দেখা লাশটার কথাও মনে পড়ে তার। ছেলেটার বয়স বেশি নয়, একটা বেশ ভাল জামা ছিল গায়ে, আর একটা ভাল প্যান্ট। ছেলেটার চুল লম্বা ছিল, বড় জুলপি আর গোঁফ ছিল। ওইরকম বড় চুল আর জুলপি রাখার সাধ সতুর খুব হয়। কিন্তু তার বাবা ননক চৌধুরী সন্তুকে মাসান্তে এক বার পপুলার সেলুন ঘুরিয়ে আনে। সেখানকার চেনা নাপিত মাথা স্ক্রু-কাট করে দেয়।

সন্তুর যে ভয় করছিল তা নয়। তবে একটু ছমছমে ভাব। কী যেন একটা হবে। ঠিক বুঝতে পারছে না স্যু, তবে মনে হচ্ছে অলকে কে যেন একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি আস্তে করে দো-বোমার পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে। এখন জোর শব্দে একটা ভয়কর বিস্ফোরণ হবে।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে শব্দ ওঠে। সতু শিউরে উঠল। অবিকল নীলমাধরের সেই সড়ালে কুকুরটা যেমন জঙ্গল ভেঙে ধেয়ে আসত ঠিক তেমন শব্দ। সন্তুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। আকাশে মেঘ চেপে আছে। চার দিকে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। সত্ কেবল প্যান্টের পকেট থেকে তার ছোট্ট দুরিটা বের করে হাতে ধরে রইল। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল সে। হাত-পা ঠান্ডা মেরে আসছে, বুক কাঁপছে, সু খুব ভয় সন্তু পায় না। পালানোর চিন্তাও সে করে না।

একটু বাদেই সে ছোট্ট কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো দেখতে পায়। রিকশার বাতি হাতে কালু আসছে। কিন্তু আসছে ঠিক বলা যায় না। কালু বাতিটা হাতে করে ভয়ংকর টলতে টলতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ মাতাল।

সন্তু টর্চটা জেলে বলে, কালু, এদিকে।

কোন শালা রে-কালু চেঁচাল।

আমি সন্তু।

কোন সন্তু?-বলে খুব খারাপ একটা খিস্তি দিল কালু।

সন্তু এগিয়ে কালুর হাত ধরে বলে, আস্তে। চেঁচালে লোক জেনে যাবে।

কালু বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলে, ওঃ, সন্তু!

হ্যাঁ।

আয়।

বলে কালু তার হাত ধরে টানতে টানতে পোড়া বাড়ির বারান্দায় গিয়ে ওঠে। তারপর সটান মেঝেতে পড়ে গিয়ে বলে, আজ বেদম খেয়েছি মাইরি! নেশায় চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সন্তু পাশে বসে বলে, কী বলবি বলেছিলি?

কী বলব?–কালু ধমকে ওঠে।

বলেছিলি বলবি। সেই খুনের ব্যাপারটা।

কোন খুন? ফলির?

হ্যাঁ।

কালু হা হা করে হেসে বলে, আমি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি সন্তু, আর বলা যাবে না।

কে দিল?

যে খুনি সে।

লোকটা কে?

কালু ঝড়াক করে উঠে বসে বলে, তোকে বলব কেন?

বলবি না?

না। পাঁচশো টাকা কি ইয়ারকি মারতে নিয়েছি?

সন্তু খুব হতাশ হয়ে বলল, তুই বলেছিলি বলবি।

কালু মাথা নেড়ে বলে, পাঁচশো নগদ টাকা পেয়ে আজ অ্যাতো মাল খেয়েছি। আরও অনেক আছে, পালবাজারে সবজির দোকান দেব, নয়তো লন্ড্রি খুলব। দেখাব?

বলে কালু তার জামার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে দেখায়। বলে, গোন তো, কত আছে। আমি বেহেড আছি এখন।

সন্তু গুনল। বাস্তবিক এখনও চারশো পঁচাশি টাকা আছে।

বলল, খুনি তোকে কিছু বলল না?

না! কী বলবে! বলল, কাউকে বলবি না, তা হলে তোকেও শেষ করে ফেলব।

পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল?

কালু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলে, দূর, পাঁচশো টাকা আর কী! এ রকম আরও কত ঝেঁকে নেব। সবে তো শুরু।

সন্তু উত্তেজিত হয়ে বলে, ব্ল্যাকমেল!

কালু চোখ ছোট করে বলে, আমি শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, আর তোমরা সব ভদ্রলোক, না?

ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয় রে। ব্ল্যাকমেল।

আমি ইংরিজি জানি না ভেবেছিস! রামগঙ্গা স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম ভুলে যাস না।

সন্তু এতক্ষণে হাসল। বলল, ব্ল্যাকমেল হল...

চুপ শালা। ফের কথা বলেছিস কি...।

বলে কালু লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সন্তু কালুর হঠাৎ রাগ কেন বুঝতে না পেরে এক পা পেছিয়ে তেজি ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে বলল, এর আগে খিস্তি করেছিস, কিছু বলিনি। ফের গরম খাবি তো মুশকিল হবে।

কালু তার বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলল, আহা চাদু! গরম কে খাচ্ছে শুনি?

বলে ফের একটা নোংরা নর্দমার খিস্তি দেয়।

সন্তু হাত-পা নিশপিশ করে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করে আনে সে। বেশি বড় না হলেও, বোতাম টিপলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে আসে। সন্তুর এখনও পর্যন্ত এটা কোনও কাজে লাগেনি।

ফলাটা কেরোসিনের বাতিতেও লকলক করে উঠল।

সন্তু বলল, দেব শালা ভরে।

দিবি? কালু উঠে দাঁড়িয়ে পেটের ওপর থেকে জামাটা তুলে বলল, দে না।

বলে জিব ভেঙিয়ে দু হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে।

সন্তুর মাথাটা গোলমেলে লাগছিল। গতবার সে একটা গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিয়েছিল। শরীরের ভিতরটা আনচান করে ওঠে। সে একটা ঝটকায় কালুকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর উঠে বসে। তারপর সম্পূর্ণ অজান্তে ছুরিটা তোলে খুব উঁচুতে। তারপর বিদ্যুবেগে হাতটা নেমে আসতে থাকে।

কালু কী কৌশল করল কে জানে! লহমায় সে শরীরের একটা মোচড় দিয়ে পাশ ফিরল। তারপর দুষ্টু ঘোড়া যেমন ঝাঁকি মেরে সওয়ারি ফেলে দেয় তেমনি সন্তুকে ঝেড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পাঁচ ইঞ্চি ফলাটা শানে লেগে ঠকাৎ করে পড়ে গেল।

কালু একটু দূরে গিয়ে ফের পড়ল। তারপর সব ভুলে ওয়াক তুলে বমি করল বারান্দা থেকে গলা বার করে।

বিস্মিত সন্তু বসে রইল হা করে! সর্বনাশ! আর-একটু হলেই সে কালুকে খুন করত! ভেবেই ভয়ংকর ভয় হয় সন্তুর।

কালু বমি করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে। মাথা লটপট করছে। অনেকক্ষণ দম নিয়ে পরে বলল, ছুরি চমকেছিস শালা, তুই মরবি।

সন্তু আস্তে করে বলে, তুই খিস্তি দিলি কেন?

কালুর কেরোসিনের বাতিটা এখনও মেঝের ওপর জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল, কালু হাসছে। একটা হাই তুলে বলে, ও সব আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাল দিলে কি গায়ে কারও ফোঁসকা পড়ে? আমাকেও তো কত লোক রোজ দুবেলা গাল দেয়। তা বলে গগনদার মতো খুন করতে হবে নাকি।

সন্তু বিদ্যুৎস্পর্শে চমকে উঠল। গগনদা!

তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে টাকাটা কে দিয়েছে কালু?

বলব কেন?

আমি জানি। গগনদা।

দূর বে!

গগনদা খুন করেছে?

কালু মুখটা বেঁকিয়ে বলে, কোন শালা বলেছে?

তুই তো বললি।

কখন? না, আমি বলিনি।

সন্তু হেসে বলে, দাঁড়া, সবাইকে বলে দেব।

কী বলবি?

গগনদা তোকে টাকা দিয়েছে। গগনদা খুনি।

কালু প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুলে বুকটা চেপে ধরে বলে, টাকা। হ্যাঁ, টাকা গগনদা দিয়েছে। তবে গগনদা খুন করেনি!

সন্তু হেসে টর্চটা নিয়ে পিছু ফিরল। ধীরেসুস্থে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে এল সে।

৫. অন্ধকার জিমনাশিয়ামে

অন্ধকার জিমনাশিয়ামে গগনচাঁদ বসে আছে। একা। অথর্বের মতো।

কিছুক্ষণ সে মেঘচাপা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের রং রক্তবর্ণ। কলকাতার আকাশে মেঘ থাকলে এ রকমই দেখায় রাত্রিবেলা।

এখন রাত অনেক। বোধহয় এগারোটা। কাল রাতে বৃষ্টির পর গ্যারাজ-ঘরটা জলে থইথই করছে। অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি জলে ডুবে আছে মেঝে। জলের ওপর ঘুরঘুরে পোকা ঘুরছে। কেঁচো আর শামুক বাইছে দেয়ালে। ও রকম ঘরে থাকতে আজ ইচ্ছে করছে না। মনটাও ভাল নেই।

অন্ধকার জিমনাশিয়ামের চারধারে এক বার তাকাল গগন। একটা মস্ত টিনের ঘর, চারধারে বেড়া। হাতের টর্চটা এক বার জ্বালল। সিলিং থেকে রিং ঝুলছে, অদূরে প্যারালাল বার, টানবার স্প্রিং, রোমান রিং, স্ন্যান্টিংবোর্ড কত কী! একজন দারোয়ান পাহারা দেয় দামি যন্ত্রপাতি। একটু আগে দারোয়ান এসে ঘুরে দেখে গেছে। মাস্টারজি মাঝে মাঝে এ রকম রাতে এসে বসে থাকে, দারোয়ান তা জানে। তবে গগনকে দেখে অবাক হয়নি। জিমনাশিয়ামের ছোট্ট উঠোনটার শেষে দারোয়ানের খুপরিতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। গগনের কাছে চাবি আছে, যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে যাবে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না গগনের। পচা জল, নর্দমার গন্ধ, পোকামাকড়। তবু থাকতে হয়। গ্যারাজ-ঘরটার ভাড়া মোটে ত্রিশ টাকা, ইলেকট্রিকের জন্য আলাদা দিতে হয় না, তবে একটা মাত্র পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই। গগনের রোজগার এমন কিছু বেশি নয় যে লাটসাহেবি করে। এ অঞ্চলে বাড়িভাড়া এখন আগুন। একটা মাত্র ঘর ভাড়া করতে কত বার চেষ্টা করেছে গগন, একশোর নীচে কেউ কথা বলে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, গগন একটু স্থিতু মানুষ, বেশি নড়াচড়া পছন্দ করে

না। গ্যারাজ-ঘরটায় তার মন বসে গেছে। অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। গ্যারাজ-ঘরটায় বেশ আছে। সে। শোভারানি বকাবকি করে, ভাড়াটেদের ক্যাচক্যাচ আছে, জলের অসুবিধে আছে, তবু খুব খারাপ লাগে না। কেবল বর্ষাকালটা বড় জ্বালায় এসে। তবু বর্ষা বৃষ্টি হক, না হলে মুরাগাছার জমি বুক ফাটিয়ে ফসল বের করে দেবে না। মানুষের এই এক বিপদ, বর্ষা বৃষ্টি গরম শীত সবই তাকে নিতে হয়, সবকিছুই তার কোনওনা-কোনওভাবে প্রয়োজন। কাউকেই ফেলা যায় না। এই যে অঞ্চলে এত মশা, গগন জানে এবং বিশ্বাসও করে যে, এইসব মশার উৎপত্তি এমনি এমনি হয়নি। হয়তো এদেরও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এই যে সাপখোপ বোলতা-বিছে, বাঘ-ভালুক- ভাল করে দেখলে বুঝি দেখা যাবে যে এদের কেউ ফেলনা নয়। সকলেই যে যার মতো এই জগতের কাজে লাগে।

গগন উঠে জিমনাশিয়ামের ভিতরে এল। মস্ত মস্ত গোটাকয় আয়না টাঙানো দেয়ালে। অন্ধকারেও সেগুলো একটু চকচক করে ওঠে। গগন টর্চ জ্বেলে আয়না দেখে। গত চার-পাঁচ বছরে এ সব আয়না তার কত চেলার প্রতিবিম্ব দেখিয়েছে। কোথায় চলে গেছে সব! আয়না কারও প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে না। এই পৃথিবীর মতোই তা নির্মম এবং নিরপেক্ষ। টর্চ জ্বেলে গগন চারিদিক দেখে। ওই রিং ধরে একদা বুল খেয়ে গ্রেট সার্কেল তৈরি করেছে ফলি! বুকে মস্ত চাই পাথর তুলেছে। বিম ব্যালান্স আর প্যারালাল বার-এ চমৎকার কাজ করত ছেলেটা। শরীর তৈরি করে। সাজানো শরীরের প্রদর্শনী গগনের তেমন ভাল লাগে না। বরং সে চায় ভাল জিমন্যাস্ট তৈরি করতে, কি মুষ্টিযোদ্ধা, কি জুডো খেলোয়াড়। সেসব দিকে ফলি ছিল অসাধারণ। যেমন শরীর সাজানো ছিল থরে বিথরে মাংসপেশিতে, তেমনি জিমন্যাস্টিকসেও সে ছিল পাকা। ফলিকে কিছুকাল জুডো আর বক্সিং শিখিয়েছিল গগন। টপাটপ শিখে ফেলত। সেই ফলি কোথায় চলে গেল।

ভূতের মতো একা একা গগন জিমনাশিয়ামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এধার-ওধার দেখে। মেঝেয় বারবেলের চাকা পড়ে আছে কয়েকটা। পায়ের ডগা দিয়ে একটা চাকা ঠং করে উলটে ফেলল সে। এক হাতে রিং ধরে একটু ঝুল খেল।

প্যারালাল বার-এ উঠে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভাল লাগছে না। মনটা আজ ভাল নেই! ফলিকে কে মারল? কেন ফলি ও সব নেশার ব্যবসা করতে গেল?

আজ সন্ধেবেলা ফিরে এসে গ্যারাজ-ঘরে বসে সে অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠ থেকেছে। না, শোভারানিদের ঘর থেকে তেমন কোনও সন্দেহজনক শব্দ হয়নি! রাত নটায় নরেশও ফিরে এল। স্বাভাবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ওপর থেকে। তার মানে ওরা এখনও ফলির মৃত্যুসংবাদ পায়নি। বড় আশ্চর্য কথা! ফলিকে এখানে সবাই একসময়ে চিনত। তবু তার মৃতদেহ কেন কেউ শনাক্ত করতে পারেনি? কেবলমাত্র পুলিশ আর কালু ছাড়া! তাও পুলিশ বলেছে, ফলি অ্যাবসকন্ডার। ফলি ফেরারই বা ছিল কেন?

মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

গগনচাঁদের বুদ্ধি খুব তৎপর নয়! খুব দ্রুত ভাবনা-চিন্তা করা তার আসে না! সবসময়ে সে ধীরে চিন্তা করে। কিন্তু যা সে ভাবে তা সবসময়ে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি-তর্ক এবং গ্রহণ বর্জনের পথ ধরে চলে। হুটহাট কিছু ভাবা তার আসে না। গগন বহুকাল ধরে নিরামিষ খায়। সম্ভবত নিরামিষ খেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু ধীর হয়ে যায়। নিরামিষ খাওয়ার পিছনে আবার গগনের একটা ভাবপ্রবণতাও আছে। ছটফটে জ্যান্ত জীব, জালে বদ্ধ বাঁচার আকুলতা নিয়ে মরে যাওয়া মাছ কিংবা ডিমের মধ্যে অসহায় ভ্রণ, এদের দেখে তার বড় মায়া হয়। আরও একটা কারণ হল, আমিষ খেলে মানুষের শরীরের স্বয়ং-উৎপন্ন বিষ টকসিন খুব বেড়ে যায়। টকসিন বাড়লে শরীরে কোনও রোগ হলে তা বড় জখম করে দিয়ে যায় শরীরকে। কেউ কেউ গগনকে বলেছে, নিরামিষভোজীরা খুব ধীরগতিসম্পন্ন, পেটমোটা। গগন তার উত্তরে তৃণভোজী হরিণ বা ঘোড়ার উল্লেখ করেছে, যারা ভীষণ জোরে ছোটে। তাদের পেটও মোটা নয়। নিরামিষ খেয়ে গগনের তাগদ কারও চেয়ে কম নয়। গতিবেগ এখনও বিদ্যুতের মতো। জুডো বা বক্সিং শিখতে আসে যারা তারা জানে গগন কত বড় শিক্ষক। তাও গগন খায় কী? প্রায় দিনই আধ সেরটাক ভাল আর সবজি-সেদ্ধ, কিছু কাঁচা সবজি, দু-চারটে পেয়ারা বা সময়কালে কমলালেবু বা আম, আধ সের দুধ, সয়াবিন, কয়েকদানা ছোলাবাদাম। তাও বড় বেশি নয়। শরীর আন্দাজে গগনের

খাওয়া খুবই কম। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনও দিনই সে বেশি মাথা ঘামায় না। এইসব মিলিয়ে গগন। ধীরবুদ্ধি, শান্ত, অনুত্তেজিত, কোনও নেশাই তার নেই।

মেয়েমানুষের দোষ নেই, তবে আকর্ষণ থাকতে পারে।

যেমন বেগম। ফলি যখন গগনের কাছে কসরত করা শিখত, তখন বহুবার বেগম এসেছে জিমন্যাশিয়ামে। সে বেড়াতে আসত বোনের বাড়ি, সেই তকে জিমন্যাশিয়ামে ছেলেকে দেখে যেত। ব্যায়ামাগারটাই ছিল বলতে গেলে ফলির বাসস্থান।

গগনের আজও সন্দেহ হয়, শুধু ছেলেকে দেখতেই আসত কি না বেগম। বরং ছেলেকে দেখার চেয়ে ঢের বেশি চেয়ে দেখত গগনকে! তার তাকানো ছিল কী ভয়ংকর মাদকতায় মাখানো। বড় বড় চোখ, পটে-আঁকা চেহারা, গায়ের রং সত্যিকারের রাঙা। রোগা নয়, আবার কোথাও বাড়তি মাংস নেই। কী চমৎকার ফিগার! প্রথমটায় গগনের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু গগন বিভিন্ন ব্যায়ামকারীর কাছে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস শেখাচ্ছে, স্যান্ডো গেঞ্জি আর চাপা প্যান্ট পরা তার বিশাল দেহখানা নানা বিভঙ্গে বেঁকেছে, দুলছে বা ওজন তুলবার সময় থামের মতো দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে, এ সবই বেগম অপলক চোখে দেখেছে। বেগমের বয়স বোঝে কার সাধ্য! তাকে ফলির মা বলে মনে হত না, বরং বছর দু-তিনেকের বড় বোন বলে মনে হত। ফলি একদিন বলেছিল, মা চমৎকার সব ব্যায়াম জানে, জানেন গগনদা! এখনও রোজ আসন করে।

বেগম প্রথমে ভাববাচ্যে কথা বলত। সরাসরি নয়, অথচ যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলত, কত দিন এখানে চাকরি করা হচ্ছে? কিংবা জিজ্ঞেস করত, জামাইবাবুর সঙ্গে কারও বুঝি খুব খটাখটি চলছে আজকাল। পরের দিকে বেগম সরাসরি কথা বলত। যেমন একদিন বলল, আপনার বয়স কত বলুন তো?

বিনীতভাবে গগন জবাব দিল, উনতিরিশ।

একদম বোঝা যায় না। বিয়ে করেছেন?

না।

কেন?

গগন হেসে বলে, খাওয়াব কী? আমারই পেট চলে না।

অত যার গুণ তার খাওয়ার অভাব!

তাই তো দেখছি।

আপনি ম্যাসাজ করতে জানেন?

জানি।

তা হলে আপনাকে কাজ দিতে পারি, করলেন?

গগন উদাসভাবে বলল, করতে পারি।

একটা অ্যাথলেটিক ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতে হবে। ওরা ভাল মাইনে দেয়।

গগন তখন বলল, আমার সময় কোথায়?

খুব হেসে বেগম বলল, তা হলে করবেন বললেন কেন? ওই ক্লাবে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। হোলটাইম জব। সময়ের অভাব হবে না। আর যদি ছুটকো-ছাটকা মাসাজ করতে চান, পক্ষাঘাতের রুগি-টুগি, তাও দিতে পারি।

গগন বলি, ভেবে দেখব।

আসলে গগন ও সব করতে চায় না, সে চায় ছাত্র তৈরি করতে! ভাল শরীরবিদ, জিমন্যাস্ট, বক্সার, জুডো-বিশেষজ্ঞ। সে খেলোয়াড়দের পা বা রুগির গা মাসাজ করতে যাবে কেন?

কিন্তু ওই যে সে ম্যাসাজ জানে ওটাই তার কাল হয়েছিল। কারণ এবার বেগম নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকায়। খবর এল, ম্যাসাজ দরকার। প্রথমে গগন যায়নি। সে কিছু আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বেগম ছাড়বে কেন? খবরের পর খবর পাঠাত। বিরক্ত হয়ে একদিন বাপুজি কলোনির বাড়িতে যেতে হয়েছিল গগনকে।

হেসে বলেছিল, খুব ব্যথা বুঝলেন।

গগন পাখানা নেড়ে-চেড়ে বলল, কোথায়?

বেগম বলল, সব ব্যথা কি শরীরে? মন বলে কিছু নেই?

তারপর কী হয়েছিল তা আর গগন মনে করতে চায় ন। তবে এটুকু বলা যায়, গগনের মেয়েমানুষে আকর্ষণ আছে, লোভ না থাক। বেগমের বেলা সেটুকু বোঝা গিয়েছিল। বলতে গেলে, তার জীবনের প্রথম মেয়েমানুষ ওই বেগম। কিছুকাল খুব ভালবেসেছিল বেগম তাকে। তারপর যা হয়? ও সব মেয়েদের একজনকে নিয়ে থাকলে চলে না! গগন তো তার ব্যবসার কাজে আসত না। বেগম তাই অন্য সব মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বেগমের দেহের সুন্দর ও ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে গগন সরে এল একদিন।

আয়নায় কোনও প্রতিচ্ছবি থাকে না। পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে, সব মুছে যায়। অবিকল আয়নার মতো।

ফলির কথাই ভাবছিল গগন। ফলি বেঁচে নেই। তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ফলি। মানুষ হিসেবে ফলি হয়তো ভাল ছিল না, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ফলি ছিল উৎকৃষ্ট। ও রকম চেলা গগন আর পায়নি।

অন্ধকার জিমন্যাশিয়ামে প্যারালাল বার-এর ওপর বসে গগনের দুচোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এল। বিড়বিড় করে কী একটু বলল গগন। বোধহয় বলল, দূর শালা! জীবনটাই অদ্ভুত!

অনেক রাতে গগন যখন গ্যারাজ-ঘরে ফিরল তখন সে খুব অন্যমনস্ক ছিল। নইলে সে লক্ষ করত, এত রাতেও পাড়ার রাস্তায় কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। আশপাশের বাড়িগুলোয় আলোও জ্বলছে।

গগন যখন তালা খুলছে তখন একবার টের পেল এ বাড়ি সে বাড়ির জানালায় কারা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখল তাকে। নরেশ মজুমদারের ঘরে স্টিক-লাইট জ্বলছে। এত রাতে ও রকম হওয়ার কথা নয়। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এ সময় সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোয়। কেবল অদূরে একটা বাড়ির দোতলায় নানক চৌধুরীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে।

গগন ঘরে এসে প্রায় কিছুই খেল না। ঠান্ডা দুধটা চুমুক দিয়ে শুলে রইল বাতি নেভাল না। ঘরে জল খেলছে, কোন পোকা-মাকড় রাতবিরেতে বিছানায় উড়ে আসে। বর্ষাকালে প্রায় সময়েই সে বাতি জ্বেলে ঘুমোয়। নরেশ মজুমদারের মিটার উঠুক, তার কী।

ঘুম না এলে গগনচাঁদ জেগে থাকে। চোখ বুজে মটকা মারা তার স্বভাব নয়। আজও ঘুম এল না, তাই চেয়ে থেকে কত কথা ভাবছিল গগন। ভিতর দিকে গ্যারেজ-ঘরের ছাদের সঙ্গে লাগানো, উঁচুতে একটা চার ফুট দরজা আছে। ওই দরজাটা সে আসবার পর থেকে বরাবর বন্ধ দেখেছে। সম্ভবত কোনও দিন ওই দরজা দিয়ে সহজে গ্যারাজে ঢোকা যাবে বলে ওটা করা হয়েছিল। বৃষ্টি-বাদলার দিনে ঘর থেকে নরেশ তার বউ নিয়ে সরাসরি গ্যারাজে আসতে পারত। এখন গ্যারাজে গাড়ি নেই, গগন আছে। তাই দরজাটা কড়াক্কড় করে বন্ধ। প্রায় সময়েই গগন দরজাটা দেখে। হয়তো কখনও ওই দরজা থেকে নেমে আসবার কাঠের সিঁড়ি ছিল। আজ তা নেই। ওও সুড়ঙ্গের মতো দরজাটাই আছে কেবল। রহস্যময়।

আশ্চর্য এই, আজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে গগন দরজাটার কথাই ভাবছিল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ খুব পুরনো একটা ছিটকিনি খোলার কষ্টকর শব্দ হল। তারপরই কে যেন হুড়কো খুলহেবলে মনে হল। সিলিং-এর দরজাটা বার দুই কেঁপে উঠল।

ভয়ংকর চমকে গেল গগনচাঁদ। বহুকাল এমন চমকায়নি। সে শোয়া অবস্থা থেকেট করে উঠে বসল। প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকে আরও ভয়ংকর চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাটা আস্তে খুলে গেল। আর চার ফুট সেই দরজার ফ্রেমে দেখা গেল, শোভারানি একটা পাঁচ ব্যাটারির মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক চোখে চেয়ে ছিল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ বড়।

শোভারানি সামান্য হাঁফাচ্ছিল। বেগমের বোন বলে ওকে একদম মনে হয় না। শোভা কালো, মোটা, বেঁটে। মুখশ্রী হয়তো কোনও দিন কমনীয় ছিল, এখন পুরু চর্বিতে সব গোল হয়ে গেছে।

শোভারানি ঝুঁকে বলল, এই এলেন?

হুঁ।-বলে বটে গগন, কিন্তু সে ধাতস্থ হয়নি।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বাইরে।

ঘোরের মধ্যে উত্তর দেয় গগন। ওরা কি তবে ফলির খবরটা পেয়েছে। তাই হবে। নইলে এত রাতে গুপ্ত দরজা দিয়ে শোভা আসত না। শোভারানির মুখে অবশ্য কোনও শোকের চিহ্ন নেই। বরং একটা উদবেগ ও আকুলতার ভাব আছে।

শোভা বলল, লাইনের ধারে যে মারা গেছে কাল সে কে জানেন?

জানি। একটু ইতস্তত করে গগন বলে।

সবাই বলছে ফলি। সত্যি নাকি?

লুকিয়ে লাভ নেই। বার্তা পৌঁছে গেছে। গগন তাই মাথা নাড়ল। তারপর কপালে হাত দিল একটু।

ফলিকে কে দেখেছে?

গগন বলল, পুলিশ দেখেছে। আর রিকশাওলা কালু।

ঠিক দেখেছে?– তীব্র চোখে চেয়ে শোভা জিজ্ঞেস করে।

তাই তো বলছে। গগন ফের কপালে হাত দেয়।

শোভারানি ঠোঁট উলটে বলল, আপদ গেছে।

বলেই ঘরে আলো থাকা সত্ত্বে টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলল মেঝেয়। বলল, ঘরে জল ঢেকে দেখছি।

বর্ষাকালে ঢোকে রোজ। গগন যান্ত্রিক উত্তর দেয়।

বলেননি তো কখনও!

গগন আস্তে করে বলে, বলার কী! সবাই জানে।

শোতা মাথা নেড়ে বলে, আমি জানতাম না।

গগন উত্তর দেয় না। শোভার কাছে এত ভদ্রব্যবহার পেয়ে সে ভীষণ ভালমানুষ হয়ে যাচ্ছিল।

শোভা টর্চটা নিভিয়ে বলল, শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

গগন উঠে বসে উর্ধ্বমুখে যেন কোনও স্বর্গীয় দেবীর কথা শুনছে, এমনভাবে উৎকর্ণ হয়ে ভক্তিভরে বসে থাকে। বলে, বলুন।

কালু একটা গুজব ছড়িয়েছে।

কী?

ফলিকে যে খুন করেছে তাকে নাকি ও দেখেছে।

গগন মাথা নেড়ে বলল, জানি।

কী জানেন?

কালু ও কথা আমাকেও বলেছে।

কে খুন করেছে তা বলেনি? শোভা ঝুকে খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে।

গগন মাথা নাড়ে, না। ও পাঁচশো টাকা দাবি করে খুনির কাছে। বলবে না।

শোভা হেসে বলে, সেই পাঁচশো টাকা কালু পেয়ে গেছে।

শোভারানির হাসি এবং শোকের অভাব দেখে গগন খুব অবাক হয়। ফলির মৃত্যুতে কি শোভার কিছু যায়-আসেনি? বোনপোটা মরে গেল, তবু ও কীরকম যেন স্বাভাবিক।

গগন ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, কার কাছে পেয়েছে?

শোভা অদ্ভুত একটু হেসে বলল, ও বলছে, টাকা নাকি ওকে আপনি দিয়েছেন।

আমি! আমি টাকা দিয়েছি!

খুব আস্তে গগনের বুদ্ধি কাজ করে। প্রথমটায় সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কী। ভেবে ভেবে জোড়া দিতে লাগল। তাতে সময় গেল খানিক।

শোভা বলল, একটু আগে কালুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

গগন তেমনি দেবী-দর্শনের মতো উর্ধ্বমুখ হয়ে নীরব থাকে। বুঝতে সময় লাগে তার। তারপর হঠাৎ বলে, আমি ওকে টাকা দিইনি।

শোভা ঠোঁট ওলটাল! বলল, ও তো বলছে!

আর কী বলছে?

শোভা হেসে বলে, খুনির নামটাও বলেছে।

কে?

বলেই গগন বুঝতে পারে তার গলার স্বর তার নিজের ফাঁকা মাথার মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি তুলল, কে!

শোভা তার চোখে চেয়ে থেকে বলল, ও আপনার নাম বলছে

আমি! আমার নাম—- বলে গগন মাথায় হাত দিয়ে বলে, না তো ও মিথ্যা কথা বলছে।

শোভা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল, কালু মদ-গাঁজা খায়। ওর কথা কে বিশ্বাস করে, আহাম্মক ছাড়া। তবে ফলিকে কেউ খুন করে থাকলেও অন্যায় করেনি আমি তো সেজন্য জোড়াপাঁঠা মানসিক করে রেখেছি।

গগন উত্তর দিতে পারে না মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে শুধু শোভার দিকে চেয়ে থাকে।

শোভা বলে, শুনুন যদি ফলিকে কেউ মেরে থাকে তো আত্মার দুঃখের কিছু নেই। আমার স্বামী কাঁদছেন। তার বোধহয় কাঁদবারই কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সব ফলির লমে লিখে দেবেন। উইল নাকি করেও ছিলেন। আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। ফলির জন্ম ভাল নয়।

গগন উত্তর দিতে পারছিল না। তবু মাথা নাড়ল।

শোভা বলল, আপনি বা যে-কেউ ওকে খুন করে থাকলে ভাল কাজই হয়েছে। পেস্তা নামে যে বাচ্চা মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, সে এখনও আমার কাছে আসে। তার বোধহয় আর বিয়ে হবে না। ফলির গুণকীর্তির কথা কে না জানে! অপু আমার স্বামীকে কিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সম্ভবত পুলিশ ডেকে আজ রাতেই আপনাকে গ্রেফতার করাকেন।

আমাকে!

শোভা সামান্য উমার সঙ্গে বলে, ও রকম ভ্যাবলার মতো অছেন কেন? এ সময়ে বুদ্ধি ঠিক না রাখলে ঝামেলায় পড়বেন।

গগন হঠাৎ বলল, কী করব?

শোভা বলে, কী আর করবেন, পালাবেন!

গগন দিশাহারার মতো বলল, পালাব কেন?

সেটা বুঝতে আপনার সময় লাগবে। শরীরটাই বড়, বুদ্ধি ভীষণ কম। পুলিশে ধরলে আটক রাখবে, মামলা হবে, সে অনেক ব্যাপার। বরং পালিয়ে গেলে ভাবার সময় পানে।

কোথায় পালাব?

সেটা যেতে যেতে ভাববেন। এখন খুব বেশি সময় নেই। এইখান দিয়ে উঠে আসতে পারবেন?

গগন হাসল এবার। সে শরীরের কসরতে ওস্তাদ-লোক। গ্যারাজঘরের ছাদের দরজায় ওঠা তার কাছে কোনও ব্যাপার নয়। মা নেড়ে বলল, খুব।

তা হলে বাতিটা নিবিয়ে উঠে আসুন। এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভাল রাস্তা আছে। কেউ দেখবে না। দেয়াল টপকে ওদিকে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের কারখানার মাঠ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবেন। দেরি করবেন না। উঠে আসুন।

গগন বাতি নিভিয়ে দেয়। শোভা টর্চ জেলে রাখে। গগন পোশাক পরে নেয়। দুটো-একটা টুকিটাকি দরকারি জিনিস ভরে নেয় ঝোলা ব্যাগে। তারপর হাতের ভর দিয়ে দরজায় উঠে পড়ে।

শোভা টর্চ জ্বেলে আগে আগে পথ দেখিয়ে দেয়। মেথরের আসবার রাস্তায় এলে শোভারানি তাকে বলে, এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। টাকা লাগবে?

গগন মাথা নাড়ে, না।

শোভা হেসে বলে, লাগবে। সদ্য সদ্য পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেছে, এখন তো হাত খালি!

গগন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তাকায়।

আর শোভারানি সেই মুহূর্তে তাকে প্রথম স্পর্শ করে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার প্যান্টের পকেটে বোধহয় কিছু টাকাই গুঁজে দেয়। খুব নরম স্বরে বলে, বেগম খারাপ। আমি খারাপ নই। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি খুন করেছেন। এখন যান। গ্যারাজ-ঘরের ভিতরটা আমি উঁচু করে দেব। সময়মতো ফিরে এসে দেখল্লে ঘরটা অনেক ভাল হয়ে গেছে। আর জিনিসপত্র যা রইল তা আমি দেখে রাখ। এখন আসুন তো।

গগন মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে করে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের পাঁচিল টপকায়। মাঠ পেরোয়।

কয়েকটা টর্চবাতি ইতস্তত কাকে যেন খুঁজছে। গগন মাথা নিচু করে এগোয়। একটা বড় গাড়ি এসে থামল কাছেই কোথাও। গগন বাদবাকি পটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। ফের পাঁচিল টপকে বড়রাস্তায় পড়ে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোনও যানবাহন নেই। কেবল একটা ট্যাক্সি সওয়ারি খালাস করে ধীরে ফিরে যাচ্ছে। গগন হাত তুলে সেটাকে থামায়। সচরাচর সেট্যাক্সিতে চড়ে না। পয়সার জন্যও বটে, তা ছাড়া বাবুয়ান তার সয়না। আজ উঠে বসল। কারণ অবস্থাটা আজ গুরুতর। তা ছাড়া শোভারানির দেওয়া বেশ কিছু টাকাও আছে পকেটে।

পৃথিবীটাকে ঠিক বুঝতে পারে না গগনচাঁদ। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেঘলা করে আসে। গ্যারাজ-ঘরে জল ওঠে আধ-হাটু। জীবনটা এ রকমই। মাঝে মাঝে বিনা কারণে এ রকম পালাতে

অবস্থাটা এখনও ঠিক বুঝতে পারে না গগন। তবু সেজন্য তার চিন্তা হয় না। এখন সে শোভারানির কথা ভাবে। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে তার।

৬. পুলিশ তেমন কিছু করেনি

কালুকে পুলিশ তেমন কিছু করেনি। দু-চারটে ঠোকনা যে না মেরেছে তা নয়, কিন্তু সে বলতে গেলে সিপাইদের আদর। পুলিশের আসল ধোলাই কেমন তা খানিকটা কালু জানে।

পুলিশের কাছে কালু কারও নাম বলেনি।

থানার বড়বাবু তাকে জিজ্ঞেস করল, তুই ফলিকে খুন হতে দেখেছিস?

কালু দম ধরে রেখে খানিক ভাবল। ভেবে দেখল, সে অনেককেই ঘটনাটা বলেছে, তাই এখানে মিছেকথা বললেনাহোক ধোলাই হবে। আর পুলিশ যদি মারে তো কোনও শালার কিছু করার নেই। তাই সে চোখ পিটপিট করে বড়বাবুর কেতকা চেহারাটা চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলল, দেখেছি।

সত্যি দেখেছিস, না কি নেশার ঘোরে বানিয়েছিস?

কালুর সেই তেজ আর নেই, যেমনটা সে সুরেন খাঁড়া, গগন আর সন্তুকে দেখিয়েছিল। পুলিশের সামনে কারই বা তেজ থাকে?

কালু মেঝেয় উবু হয়ে বসা অবস্থায় মাথা চুলকে বলল, নেশাও ছিল, তবে আবছা দেখেছি।

বড়বাবুর বুটসুদ্ধ মোটা একখানা পা তার কাঁকালে এসে লাগল এ সময়ে। খুব জোরে নয়, তবে কালু তাতেই টাল্লা খেয়ে হড়াত করে পড়ে গেল। একদাঁত হেসে সে আবার উঠে বসে।

বড়বাবুর মুখে হাসি নেই, ভ্রু কুঁচকে বলে, ঠিকসে বল।

অন্ধকার ছিল যে।

সেখানে তুই কী করছিলি?

সাঁজ বাজারে একটা লোক তাড়ি আনে। রোজ যেয়ে তার কাছে বসি।

বড়বাবু পা ফের তুলে বলে, এটুকু বয়সেই মালের পাকা খদ্দের!

খাই মাঝে মাঝে, তাকত পাই না নাহলে।

এবারের লাথিটা আরও আস্তে এল। লাগল না তেমন।

বড়বাবু বলে, ঠিক করে বল কী করছিলি।

বড় একটা ভাড় নিয়ে লাইনের ধারে বসে খাচ্ছিলাম। এ সময় কতগুলো ছেলে এল লাইনের ওধারে। কী সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে।

কিছুতে শুনতে পাসনি?

না, আস্তে বলছিল।

ঝগড়া কাজিয়া বলে মনে হয়েছিল?

না। আপসে যেমন কথা হয় দোস্তদের মধ্যে।

তারপর?

ওরা আমাকে দেখেনি, জায়গাটা অন্ধকার।

কজন ছিল?

চার-পাঁচ জন হবে। তাদের একজন খুব লম্বা-চওড়া।

অন্ধকারে বুঝলি কী করে?

বললাম তো আবছা দেখা যাচ্ছিল।

লম্বা-চওড়া নোকটা কে? গগন?

কী জানি!

তবে লোককে বলছিস কেন যে গগনবাবু লাশ নামিয়েছে?

কাল অবাক হয়ে বলে, কখন বললাম?

বলিসনি?-বড়বাবু চোখ পাকিয়ে বলে।

মাইরি না।

এই সময়ে একটা সিপাই পাশ থেকে ঠোকা মারে। খুব জোরে নয়, তবে তাতে কালুর ডান গালের চামড়া থেতলে রক্ত বেরিয়ে গেল, আর কষের একটা দাঁতের গোড়া বুঝি নাড়া খেয়ে আরও খানিক রক্ত চলকে দিল। মুখের রক্ত ঢোক গিলে পেটে চালান দিয়েছিল কালু। থানায় ধরে আনার পর থেকে দাতে কুটো পড়েনি। পেট জ্বলছে।

বড়বাবু বলে, সব ঠিকঠাক করে বল।

কালু হাসবার চেষ্টা করে বলে, বলছি তো বড়বাবু, গগনদার কথা কাউকে বলিনি।

খুনটা কেমন করে হল?

সে খুব সাংঘাতিক। হঠাৎ দেখি সেই চার-পাঁচজনের মধ্যে একজনকে সেই জোয়ান লোকটা পিছন থেকে কী দিয়ে যেন মাথায় মারল।

জোরে মারল?

তেমন জোরে নয়, তবে ছেলেটা পড়ে গেল মাটিতে।

তারপর?

তারপর একটা তোয়ালে বা কাপড় কিছু একটা দিয়ে ছেলেটার গলা পেঁচিয়ে সেই জোয়ান লোকটা খুব চেপে ধরল।

কতক্ষণ?

খুব বেশিক্ষণ নয়, ভয়ে আমি শব্দ করিনি।

তারপর কী হল?

লোকগুলো চলে গেল।

তুই খুনিকে চিনতে পারিসনি?

মাইরি না।

তবে তোকে টাকা দিল কে?

টাকা। কালু খুব অবাক হয়।

তোকে নাকি খুনি পাঁচশো টাকা দিয়েছে?

মাইরি না বড়বাবু

কালু পা ধরতে যাচ্ছিল, এ সময়ে আর একটা বেতাল ঠোকনা খেয়ে পড়ে যায়। মাথার পিছনে বাঁ ধারে মুহূর্তের মধ্যে একটা আলু ফুটে উঠল। ঝা ঝা করছিল ব্যথায়।

টাকা পাসনি?

কালু দাতে দাঁত চেপে ভাবছিল কোন শালা কথাটা ফাস করেছে! সন্তু জানে, আর রিকশাওয়ালা নিতাই তার দোস্ত, সে জানে। আর সুরেন, গগন এ রকম দু-চারজনকে সে মুখে বলেছিল বটে যে টাকা পেলে খুনির নাম বলবে। এদের মধ্যেই কেউ ব্যাপারটা ফাস করেছে। কালুর সন্দেহ সত্যুকে। ও রকম হাড়বজাত ছেলে হয় না।

না। কালু চোখের জল মুছে বলে পুলিশ অবশ্য তাকে ধরে এনে প্রায় উদোম করে সার্চ করেছে। টাকা পায়নি।

মারধর কালুর যে খুব লাগে তা নয়। কিন্তু এটা ঠিক তাকে কেউ গমের বস্তা বলে মনে করলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে হুজ্জত করার মুরোদ কারই বা থাকে?

বড়বাবু বললেন, দ্যাখ দড়ামি করিস না, করলে মেরে পাট করে দেব। আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু রোজ এসে হাজিরা দিয়ে যাবি। সত্যি মিথ্যে কী কী বলেছিস তার সব আমরা টের পেয়ে যাব। এটা সত্যিই খুনের মামলা কি না, না কি তুই ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তুলেছিস, এ সব জানতে আমাদের বাকি থাকবে না। যদি শালা আমাদের ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করে থাকো তবে জন্মের মতো খতম হয়ে যাবে।

কালুকে এরপর প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কাল অবশ্য তাতে কিছু মনে করেনি। সে জানে সে একটা রিকশাওয়ালা মাত্র। কাজটা এতই ছোট যে দুনিয়ার কারও কাছে কিছু আশা করা যায় না। ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়বার সময়েই সে কেন যেন টের পেত যে তার জীবনটা খুব সুখের হবে না। গড়ফায় তার

বাবার একটা টিনের ঘর ছিল, উঠোন নিয়ে মোট চার কাঠা জমি। উদ্বাস্তুদের জবর-দখল জায়গা। সেইখানে ছেলেবেলা থেকেই নানা অশান্তিতে বড় হয়েছে। বাবা রোজ মাকে দা বা কুড়ুল নিয়ে কাটতে যেত, দিদি বাসন্তী গিয়ে আটকাত। মা আর দিদি দুজনেই ঝিগিরি করে বেড়াত, বাবা ছিল কাঠের মিস্ত্রি, প্রায় দিনই কাজ জুটত না। তার ওপর লোকটার একটা ভয়ংকর অর্শের যন্ত্রণা ছিল যার জন্য বেশিক্ষণ উবু হয়ে বসে কাজ করতে পারত না, রোজগার যা হত তাতে দুবেলা খাওয়া জুটে যেত মাত্র, তা সে যে-ধরনের খাবারই হোক! দিদি বাসণ্তীর চরিত্র খারাপ নয় তবে বাসন্তী যার সঙ্গে বিয়ে বসল তার আগের পক্ষের বউ আর চার-চারটে ছেলেমেয়ে আছে। জেনেশুনেই করল। সে লোকটার আবার বাসন্তীকে নিয়ে সন্দেহবাতিক, কোথাও বেরোতে দেয় না। এইসব ছেলেবেলা থেকে দেখেছে কালু। বাবার মৃত্যু দেখেছে চোখের সামনে। অর্শ থেকেই খারাপ ঘা হয়ে গিয়ে থাকবে। রক্ত পড়ত দিনরাত। শেষদিকে ওই রক্তপাতেই দিন দিন ক্ষীণ হয়ে হয়ে একদিন রাতে ঘুমিয়ে সকালে আর ওঠেনি। মা এখনও ঝি খেটে বেড়ায়, ছোট বোন হেমন্তীও বেরোচ্ছে কাজে, ছোট ভাই ভুতু আর হাবু সন্ধ্যাবাজারে ডিম বেচে আর চুরি করে বেড়ায়। ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠে কালুকে থামতে হল। পড়তে ভাল লাগত না।

সেই থেকে কালুর সব দুঃখবোধ আর কান্না বিদায় নিয়েছে। কেমন যেন ভোতা হয়ে গেছে সে। মনে কিছু ভুরভুরি কাটে না। গাল খেলে গাল দেয়, মার খেলে উলটে মার দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যস, এই ভাবেই যতদিন বেঁচে থাকা যায়। কালু যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে শিখেছে তা হল টাকা। টাকার মতো কিছু হয় না।

সেলিমপুরে সওয়ারি ছেড়ে রিকশাওয়ালা মগন ফাঁড়ির উলটোদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বসে ছিল। যাদবপুরে ফিরবে, সওয়ারি পাওয়ার লোভে খানিক অপেক্ষা করছিল।

কালু গিয়ে মগনকে বলল, নিয়ে চলো দেখি মগনদা।

তোর গাড়ি কে খায়?

ছেড়ে এসেছি, পুলিশ ধরে আনল একটু আগে।

মগন ঝুঁকে বলল, পুলিশ। আই বাপ। কী হয়েছিল?

সে অনেক কথা, পরে কোনও সময়ে শুনো।

পেঁদিয়েছে তোকে?

ও শালার সম্বন্ধীর পুতেরা কাকে না প্যাদায়?

মগন রিকশার হুড তুলে দিয়ে বলল, চেপে বোস, শালারা আবার টের না পায় যে আমার গাড়িতে উঠেছিস!

মগন রিকশা ছেড়ে জোরহাল।

কালু কেতরে বসেছিল তার সিটে, মারধর নয়, আসলে খিদেয় পেট ব্যথা করছে। মদের ঝোঁকটা উবে গেছে কখন। এখন পেটে একটা চোঁ-ব্যথা। তবে তার মনটা এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে পুলিশের হাতে পড়েও সে কারও নাম বলেনি।

এইট বি বাস স্ট্যান্ডে ছেড়ে দিয়ে মগন বলল, মানিককে তিন দিনের পয়সা দিইনি।

কালু দাঁত বের করে বলল, আমার এক হপ্তা বাকি কাল থেকে গাড়ি দেবে না। তার ওপর পুলিশ লেগেছে।

দুদিন জোর বৃষ্টি হলে ভাল সওয়ারি পাওয়া যায়।

ইচ্ছেমতো তো আর বৃষ্টি হবে না।

মগন গাড়ি মালিয়ে বাড়িতে তুলে রাখতে বিজয়গড় গেল।

কালু স্টেশন রোডের মুখখানিক দাঁড়িয়ে আর-একটা রিকশা খুঁজল। পেল না, হাঁটতে লাগল। বাড়ি না গেলেও হয়। গরফা পর্যন্ত ঘটতে ইচ্ছে করছে না খিদে পেটে।

স্টেশনের গায়ে একটা তেলেভাজার ঝোপড়ার দোকান আছে। সেটা চালায় বিশে, তার দোস্ত, সেখানে গেলে কিছু খাবার জুটতে পারে। শোওয়ার কার অভাব নেই স্টেশনে গামছা পেতে পড়ে থাকলেই।

বিশে জেগে ছিল, কেপড়ায় হরিকেন জ্বলছে। এই বিধিকিধিরি কম দামের ট্রানজিস্টারে কোথাকার একটা পুরনো হিন্দি গান হচ্ছে।

তাকে দেখে বিশে দাঁতের বিড়ি ফেলে দিয়ে, পরশু মাল খাওয়াবি কথা ছিল।

কালু বলে, কাল খাওয়াব।

তোর শালা মুখ না ইয়ে।

বেশি মেজাজ লিস না বিশে, আমার কচকচে সাড়ে চারশো টাকা আছে।

যা যা।

কিছু পেটের ব্যবস্থা হবে?

বিশে বলল, শালা রোজ এসে জ্বালালে এবার ঝাপড় খাবি।

তা বলে বিশে ফিরিয়ে দেয় না। মুড়ি, ছোলাসেদ্ধ আর ঠাণ্ডা বেগুনি খাওয়ায়। তারপর দুই বন্ধুতে বিড়ি ধরিয়ে গিয়ে স্টেশনে শুয়ে পড়ে গল্পগাছা করতে থাকে। বিশের মা ঝোপড়া আগলে রাখে।

বিশে সব শুনে বলে, তুই শালা ঘুমচক্করে পড়বি। খুনখারাবি নিয়ে দিল্লাগি নয় দোস্ত। সত্যি কথা বল তো কাউকে দেখেছিলি?

স্টেশনের শক্ত মেঝের ওপর-চট পেতে শোয়া কালু ফিরে বিশের দিকে চেয়ে বিড়িতে টান মেরে বলে, তুই লাশটা দেখেছিলি?

বিশে বলে, দেখব না কেন? লাইনের ধারে দিনভর পড়ে ছিল। অনেক বার গিয়ে দেখেছি।

চিনতে পেরেছিলি?

বিশে মাথা নেড়ে বলে, খুব। ফলি গুন্ডাকে কে না চেনে? এ সব জায়গাতেই আড্ডা ছিল। সব সময়ে ট্রেনে আসত আর ট্রেনেই চলে যেত।

ট্যাবলেট বেচতে আসত যে আমিও জানি। কিন্তু ট্রেন আসত কেন বল তো?

মনে হয় পাড়ায় ঢুকতে ভয় পেত। বাসে-টাসে এলে তো বড় রাস্তা বা স্টেশন রোড ধরে আসতে হবে। ও সব জায়গায় ওর কোনও বিপদ ছিল মনে হয়।

কালু আর-একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, লুকিয়ে চুরিয়ে আসত তা হলে!

বিশে গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু ফলিরও দল ছিল। সন্তোষপুর, পালবাজার, স্টেশন রোড এ সব এলাকার বিস্তর মস্তান ছিল ওর দোস্ত। আমার দোকানে এসে ইট পেতে বসে কত দিন দিশি মাল আর তেলেভাজা খেয়েছে।

তুই তা হলে ভালই চিনতি?

বললাম তো।

তুই খুনটা নিজে চোখে দেখলি?

নিজের চোখে।

খুনিকেও চিনলি?

কালু হেসে বলে, নাম বলব না তা বলে। চিনলাম।

বিশে একটা আস্তে লাথি মারল কালুর পাছায়।

তারপর বলল, মালকড়ি ঝাকবি?

ঝেঁকেছি, কাল তোকে মাল খাওয়াব।

বিশে ঘুমোয়। কালুর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। গালটা ফুলে টনটনে ব্যথা হয়েছে। মাজাতেও ব্যথা বড় কম নয়। এপাশ-ওপাশ করে সে একটু কোঁকাতে থাকে।

শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কাল। উঠতে অনেক বেলা হল। দেখল, বিশে উঠে গেছে। স্টেশনে গিজগিজ করছে।

লাইন পার হয়ে কালু পাড়ায় ঢুকে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে।

দরজায় পা দিতে-না-দিতেই মা চেঁচিয়ে বলে, হারামজাদা বজ্জাত, কার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলি? কাল রাতে চারটে গুন্ডা এসে বাড়ি তছনছ করেছে। ছেলেদুটোকে ধরে কী হেনস্থা, যা বাড়ি থেকে দূর হয়ে! গুন্ডা বদমাশ কোথাকার!

৭. নানক চৌধুরী

নানক চৌধুরীর পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে পাড়ার অনেকখানি দেখা যায়।

ঘরে নানক চৌধুরী একাই থাকে। বাড়ির কারও সঙ্গেই হলাহলি-গলাগলি নেই, এমনকী স্ত্রীর সঙ্গেও না। নিজের ঘরে বইপত্র আর নানান পুদ্রিব্যের সংগ্রহ নিয়ে তার দিন কেটে যায়। কাছেই একটি কলেজে নানক অধ্যাপনা করে। না করলেও চলত, কারণ টাকার অভাব নেই।

টাকা থাকলে মানুষের নানা রকম বদ খেয়াল মাথা চাড়া দেয়। নানক চৌধুরী সেদিক দিয়ে কঠোর মানুষ। মদ-মেয়েমানুষ দূরের কথা নানক সুপুরিটা পর্যন্ত খায় না। পোশাকে বাবুয়ানি নেই, বিলাসব্যসন নেই। তবে খরচ আছে। জমানো টাকার অনেকটাই নানকের খরচ হয় হাজারটা পুরাদ্রব্য কিনতে গিয়ে। ইতিহাসের অধ্যাক হলেও নানক প্রত্নবিদ নয়। তাই সেসব জিনিস কিনতে গিয়ে সে ঠকেছেও বিস্তর। কেউ একটা পুরনো মূর্তি কি প্রাচীন মুদ্রা এনে হাজির করলেই নানক ঝটপট কিনে ফেলে। পরে দেখা যায় যে জিনিসটা ভুয়া। মাত্র দিন সাতেক আগে একটা হা-ঘরে লোক এসে মরচে-ধরা একটা ছুরি বেচে গেছে। ছুরিটা নাকি সিরাজদৌল্লার আমলের। প্রায় ন'শ টাকা দণ্ড দিয়ে সেটা রেখেছে নানক।

দেখলে নানককে বেশ বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। দাড়ি-গোঁফ থাকায় এখন তো তাকে রীতিমতো বুড়োই লাগে। কিন্তু সন্তুদি তার বড় ছেলে হয়, তা হলে তার বয়স খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। নানকের হিসেবমতো তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশি।

রাত বারোটা নাগাদ নানক তার পশ্চিমধারের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকে পাড়ার বড়রাস্তা দেখা যায়। পাশের বাড়িটা নিচু একটা একতলা। তার পরেই নরেশের বাড়ির ভিতর দিকের উঠোন। উঠোনে আলো নেই বটে, তবে বাড়ির ভিতরকার আলোর কিছু আভা এসে উঠোনে পড়েছে। লোকজন কাউকে দেখা যায় না। এত রাতে আলো বা

লোকজন দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। তবে আজকের ব্যাপার আলাদা। ফলি নামে কে একটা ছেলে লাইনের ধারে মারা গেছে, তাকে নিয়ে নানা গুজব। কেউ বলছে খুন। একটা রিকশাওয়ালা খুনির নাম বলেছে গগন। এই নিয়ে পাড়ায় ভীষণ উত্তেজনা। প্রায় সবাই জেগে গুজগুজ ফুসফুস করছে।

গুজব নানকের পছন্দ নয়। সে জানে কংক্রিট ফ্যাক্ট ছাড়া কোনও ঘটনাই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাস্য নয়। তার নিজের বিষয় হল ইতিহাস, যা কিনা বারো আনাই কিংবদন্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশই কেচ্ছাকাহিনি। তা ছাড়া ইতিহাস মানেই হচ্ছে রাজা বা রাজপরিবারের উত্থান-পতনের গল্প। তাই ইতিহাস সাবজেক্টটাকে দুচোখে দেখতে পারে নানানক। তার ইচ্ছে এমন ইতিহাস লেখা হোক যা সম্পূর্ণ সত্যমূলক এবং সমাজবিবর্তনের দলিল হয়ে থাকবে। ইতিহাস মানে গোটা সমাজের ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য প্রাচীন ইতিহাসগুলো সেদিক থেকে বড়ই খণ্ডিত।

নানক দাঁড়িয়ে চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিল। চারদিককার পৃথিবী সম্পর্কে সে এখন কিছুটা উদাস এবং নিস্পৃহ। তার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থটি হল রবিনসন ক্রুশো। এই প্রায়-শিশুপাঠ্য বইটি যে কেন তার প্রিয় তা এক রহস্য। তবে নানক দেখেছে, যখনই তার মন খারাপ হয় বা অস্থিরতা আসে তখন রবিনসন ক্রুশো পড়লেই মনটা আবার ঠিক হয়ে যায়। শুনলে লোকে হাসবে কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

আজ বিকেল থেকে নানকের মনটা খারাপ, তার প্রত্নবিদ বন্ধু অমলেন্দু এসেছিল, ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখে বলেছে, এ হল একেবারে ব্রিটিশ আমলের বস্তু। বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশি নয়। তবে একটু ঐতিহাসিক নকলে তৈরি হয়েছিল বটে। ননশোটা টাকা গালে চড় দিয়ে নিয়ে গেহে হে।

নানক চৌধুরী তখন থেকেই রবিনসন ক্রুশো পড়ে গেছে। এখন মনটা অন্যমনস্ক। নানক চৌধুরী নিজেকে সেই নিরালা দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশো বলে ভাবতে ভারী ভালবাসে।

সে যদি ও রকম জীবন পায় তবে ফ্রাইডের মতো কোনও সঙ্গীও জোটাবে না। এ রকম একা থাকবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে নানক হঠাৎ নরেশের বাড়ির উঠোনে টর্চের আলো দেখতে পায়। সেই সঙ্গে দুটো ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি হলেও চিনতে অসুবিধে নেই। বিপুল মোটা বেঁটে শোভারানিকে অন্ধকারেও চেনা যায়। আর গরিলার মতো হোঁতকা জোয়ান-জোয়ান চেহারার গগনকেও ভুল হওয়ার কথা নয়।

দুজনে করছে কী ওখানে? কোনও লাভ- অ্যাফেয়ার নয় তো!

একটু বাদেই নানক দেখে গগন দেয়াল ডিঙোচ্ছে। শোভারানি টর্চ জ্বেলে ধরে আছে। গগন দেয়ালের ওপাশে নেমে না-যেতে যেতেই পুলিশের গাড়ির আওয়াজ রাস্তায় এসে থামে। ভারী বুটের শব্দ। কিছু টর্চের আলো এলোমেলো ঘুরতে থাকে।

তা হলে এই ব্যাপার।

নানক চৌধুরী লুঙ্গির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘর থেকে বেরোয়। নিজের ঘরে তালা দেওয়া তার পুরনো অভ্যাস। বাড়ির কারও বিনা প্রয়োজনে তার ঘরে ঢোকা নিষেধ। তালা দিয়ে নানক নীচে নেমে আসে। চাকরকে ডেকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় বেরোয়।

মুখোমুখি একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা। নানক বলে, কাউকে খুঁজছেন?

অফিসার বলে, হ্যাঁ। গগন নামে কাউকে চেনেন?

চিনি।

লোকটা ঘরে নেই। পালিয়েছে।

নানক বলে, হ্যাঁ। আমি পালাতে দেখেছি।

কোন দিকে?

পিছনের দেয়াল টপকে ল্যাবরেটারির মাঠ দিয়ে। এখন আর তাকে পাবেন না। বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

কখন গেল?

মিনিট দশ-পনেরো হবে। নরেশ মজুমদারের স্ত্রীও ছিল। পালাবার সময় টর্চ দেখাচ্ছিল।

আপনি কে?

নানক চৌধুরী প্রফেসর।

নানক চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে পুলিশ অফিসার খুব বেশি প্রভাবিত হননি। শুধু বললেন পালিয়ে যাবে কোথায়?

এত রাতেও পাড়ার লোক মন্দ জমেনি চার দিকে। তা ছাড়া চারিদিকের বাড়ির জানালা বা বারান্দায় লোক দাঁড়িয়ে দেখছে।

রাস্তার ভিড় থেকে সুরেন খাঁড়া এগিয়ে এসে একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, মদনদা, তোমরা একটা মাতাল আর চ্যাংড়া রিকশাওলার কথায় বিশ্বাস করে অ্যারেস্ট করতে এলে, এটা কেমন কথা?

পুলিশ অফিসারের নাম মদন। সুরেনের সঙ্গে এ অঞ্চলের সকলের খাতির। অফিসার একটু ভ্রু কুঁচকে বলেন, অ্যারেস্ট করতে এসেছি বললে ভুল হবে। আসলে এসেছি এনকোয়ারিতে। তা তুমি কিছু জানো নাকি সুরেন?

কী আর জানব? শুধু বলে দিচ্ছি, কালুর কথায় নেচো না। ও মহা বদমাশ। গগনকে আমরা খুব ভাল চিনি। সে কখনও কোনও ঝাটে থাকে না।

থাকে না তো পালাল কেন?

সে পালিয়েছে কে বলল! পালায়নি। হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে ভয় খেয়ে। মদনদা, তোমাদের কে না ভয় খায় বলো?

পুলিশ অফিসার একটু হেসে বললেন, আরও একজন এভিডেন্স দিয়েছে, শুধু কালুই নয়। গগনবাবুর ল্যান্ডলর্ড নরেশ মজুমদার। আবার এই প্রফেসর ভদ্রলোক বলেছেন, গগনের সঙ্গে একটু আগেই নাকি মিসেস মজুমদারকেও দেখা গেছে। তোমাদের এ পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার বেশ ঘোরালো দেখছি।

নরেশ মজুমদার এতক্ষণ নামেনি। এইবার নেমে আসতে সবাই তার চেহারা দেখে অবাক। রাস্তার বাতি, পুলিশের টর্চ আর বাড়ির আলোর জায়গাটা ফটফট করছে আলোয়। তাতে দেখা গেল নরেশ মজুমদারের চোখে-মুখে স্পষ্ট কান্নার ছাপ। চুলগুলো এলোমেলো। গায়ে জামা-গেঞ্জি কিছুই নেই পরনে একটা লুঙ্গি মাত্র।

নরেশ নেমে এসেই মদনবাবুকে হাতজোড় করে বলে, ভিতরে চলুন। আমার কিছু কথা আছে।

মদন সুরেনের দিকে ফিরে একটু চোখ টিপলেন। প্রকাশ্যে বললেন, সুরেন, তুমি তো পাড়ার মাথা, তা তুমিও না হয় চলো সঙ্গে।

নরেশ বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সুরেন খুব ডাটের সঙ্গে বলে, নরেশবাবু কথা আপনার যা-ই থাক, বিনা প্রমাণে আপনি গগনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করেননি। কাল সন্ধেবেলা গগন জিমনাশিয়ামে ছিল, ত্রিশ-চল্লিশ জন তার সাক্ষী আছে।

নরেশ গম্ভীরমুখে বলে, সব কথা ভিতরে গিয়েই হোক। রাস্তা-ঘাটে সকলের সামনে এ সব বলা শোভন নয়। আসুন।

নরেশের পিছু পিছু সুরেন আর মদন ভিতরে ঢোকে।

নানক চৌধুরী ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। তাকে ওরা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। অথচ একটা অতি গুরুতর ব্যাপারের সে প্রত্যক্ষদর্শী।

ঘরের এক ধারে একটা রিভলভিং চেয়ারে বেগম আধ-শোয়া হয়ে চোখ বুজে আছে, কপালে একটা জলপট্টি লাগানো, ডান হাতের দুটো আঙুলে কপালের দুধার চেপে ধরে আছে। তার কান্না শোনা যাচ্ছে না, তবে মাঝে মাঝে হেঁচকির মতো শব্দ উঠছে।

শোভারানি ভিতরের দরজায় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তার দুচোখে বেড়ালের জলন্ত দৃষ্টি।

নরেশ মজুমদার যখন তার অতিথিদের এনে ঘরে ঢুকল তখন শোভারানির ঠোটে একটা হাসি একটু ঝুল খেয়েই উড়ে গেল।

বেগম এক বার রক্ত চোখ মেলে তাকায়। আবার চোখ বুজে বসে থাকে। নরেশ মজুমদার গেমের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে মদনের দিকে চেয়ে বলে, ওই হল ফলির মা, আমার শালি।

মদন গভীরমুখে বলে, ও সব আমরা জানি।

নরেশ মজুমদার এ কথায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, এতক্ষণ আমি আমার শালির সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

মদন আর সুরেন দুটি ভারী নরম সোফায় বসে। সুরেন বলে, অনেক রাত হয়েছে নরেশবাবু, কথাবার্তা চটপট সেরে ফেলুন।

নরেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সুরেনের দিকে চেয়ে বলে, আপনি বলছিলেন গতকাল গগন সন্ধেবেলায় জিমনাশিয়ামে ছিল। আপনি কি ঠিক জানেন ছিল?

আলবত– সুরেন ধমকে ওঠে।

সুরেশ মাথা নেড়ে বলে, না সুরেনবাবু গগন সন্ধেবেলায় জিমনাসিয়ামে ছিল না। সে সন্ধে সাতটার পব ব্যায়াম শেখাতে আসে। তারও সাক্ষী আছে।

সুরেন পা নাচিয়ে বলে, এ এলাকায় গগনকে সবাই চেনে নরেশবাবু। সে দেরি করে জিমনাশিয়ামে এলেও কিছু প্রমাণ হয় না। জিমনাশিয়ামে যাওয়ার আগে সে কোথায় ছিল সেইটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য? তার জবাবে বলি, যেখানেই থাক লুকিয়ে ছিল না। আপনি গগনের পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো?

এ কথা শুনে বেগম আবার তার রক্তরাঙা চোখ খুলে তাকাল। সোজা সুরেনের দিকে চেয়ে কান্নায় ভাঙা ও ভারী স্বরে বলল, গগনবাবু কাল সন্ধেবেলা কোথায় ছিলেন তা কি আপনার জানা। আছে?

না।

তা হলে জামাইবাবুকে আমোক চোখ রাঙাচ্ছেন কেন? যদি জানা থাকে তা হলে সেটাই বলন।

মদন কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার বলল, ও সব কথা থাক। সাসপেক্ট কোথায় ছিল না ছিল সেটা পরে হবে। আপাতত আমি জানতে চাই আপনারা কোনও ইনফর্মেশন দিতে চান কি না, আজেবাজে খবর দিয়ে আমাদের হ্যারাস করবেন না। কংক্রিট কিছু জানা থাকলে বলুন।

নরেশ মজুমদার বলল, ফলি কি খুন হয়েছে?

মদন গম্ভীর মুখে বলে, পোস্টমর্টেমের আগে কী করে তা বলা যাবে?

খুন বলে আমাদের সন্দেহ হয় না?

আমরা সন্দেহন্দেহ করতে ভালবাসি না। প্রমাণ চাই।

কিন্তু আই-উইটনেস তো আছে।

সুরেন ফের ধমকে ওঠে, উইটনেস আবার কী? একটা বেহেড মাতাল কী বলেছে বলেছে সেটাই ধরতে হবে নাকি?

শোভারানি এতক্ষণ চুপ ছিল, এবারসাম্যসুর করেনরেশকে বলল, তোমার অত দরদ কীসের বলল তো?

তুমি ভিতরে যাও।

কেন, তোমার হুকুমে নাকি?

নরেশ রেগে গিয়ে বলে, যাবে কি না!

যাব না। আমার কথা আছে।

কী কথা?

তা পুলিশকে বলব।

মদন হাই তুলে বলল, দেখুন, এখনও কেসটা ম্যাচিওর করেনি। চিলে কান নেওয়ার বৃত্তান্ত। খুন না দুর্ঘটনা কেউ বলতে পারছে না। আপনারা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

নরেশ বলল, যদি খুনটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে?

কিন্তু খুনের তো কিছু কংক্রিট প্রমাণ বা মোটিভ থাকবে।

নরেশ বলল, আপনারা পুলিশের কুকুর আনলেন না কেন? আনলে ঠিক

মদন হেসে উঠে বলে, কুকুরের চেয়ে মানুষ তো কিছু কম বুদ্ধি রাখে না। আপনার যা বলার বলুন না।

বেগম তার রিভলভিং চেয়ার আধপাক ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বলে, আমাদের তেমন কিছু বলার নেই। তবে আমাদের যা সন্দেহ হচ্ছে তা আপনাদের বলে রাখলাম। আপনারা কেসটা চট করে ছেড়ে দেবেন না বা অ্যাকসিডেন্ট বলে বিশ্বাস করবেন না।

ঠিক আছে। এ ছাড়া আর কিছু বলবেন?

গগনবাবুকে আপনারা ধরতে গেলেন না?

কেন ধরব?-মদন অবাক হয়ে বলে।

ধরতেই তো এসেছিলেন।

মদন হেসে বলল, হুটহাট লোককে ধরে বেড়াই নাকি আমরা?

তা হলে কেন এসেছিলেন?

আপনার জামাইবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা ছাড়া কালুও কিছু কথা আমাদের কাছে বলেছে। আমরা তাই গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উনি তো পালিয়ে গেলেন। তাইতেই তো প্রমাণ হয় ওঁর দোষ কিছু-না-কিছু আছে।

সুরেন ঝেকে উঠে বলে, না, হয় না।

নরেশ বলে, কালু যে গগনকে দেখেছে নিজের চোখে সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?

এবার পুলিশ অফিসার মদন একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, নরেশবাবু, কালু কিন্তু কারও নাম বলেনি। আর গগনবাবু যে পালিয়েছেন সেও গট-আপ ব্যাপারটা হতে পারে। কারণ

পাড়ার একজন বলছেন যে, একটু আগে আপনার স্ত্রীই নাকি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।

৮. ট্যাক্সিতে বসে

ট্যাক্সিতে বসে গগন কিছুক্ষণ মাথা এলিয়ে চোখ বুজে রইল। মাথাটা বড্ড গরম, গা-ও গরম। মনের মধ্যে একটা ধাঁধা লেগে আছে।

গোলপার্কের কাছ বরাবর এসে ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবেন?

কোন চুলোয় যাবে তা গগনের মাথায় আসছিল না। কলকাতায় তার আত্মীয়স্বজন বা চেনাজানা লোক হাতে গোনা যায়। কালীঘাটে এক পিসি থাকে। কিন্তু পিসির অবস্থা বেশি ভাল নয়। ছেলের বউয়ের সংসারে বিধবা পিসি কোল ঘেঁষে পড়ে থাকে, তার কথার দাম কেউ বড় একটা দেয় না। তা ছাড়া আপন পিসিও নয়, বাবার মামাতো বোন।

আর এক যাওয়া যায় ছটকুর কাছে। বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় না বটে কিন্তু ছটকু একসময়ে গগনের সবচেয়ে গা-ঘেঁষা বন্ধু ছিল।

গগনের বন্ধু মানেই গায়ের জোরওলা, পেশিবহুল মনুষ। ছটকু ঠিক তা নয়। আড়েবহরে ছটকু খুব বেশি হবে না। সাড়ে পাঁচ ফুটিয়া পাতলা গড়নের ছিমছাম চেহারা। তবে কিনা ছটকু একসময়ে বালিগঞ্জ শাসন করত। আর সেটা করত বুদ্ধির জোরে। মারপিট করতে ছটকুকে কম লোকই দেখেছে। তবে দারুণ তেজি ছেলে, দরকার পড়লে দুহাজার লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে। ফেদার ওয়েটে ভাল বক্সার ছিল কলেজে পড়ার সময়। গগন যখন কলেজে পড়তে আসে ওই ছটকু ছিল তার ক্লাসের বন্ধু, পরে জিমনাশিয়ামে গায়ের ঘাম ঝরাতে গিয়ে পরিচয়টা আরও গাঢ় হয়।

বক্সিং ছটকু খুব বেশি দিন করেনি, কলেজের প্রথম দিকে খুব লড়ালড়ি করল কিছুদিন। ফোর্ট উইলিয়ামে এক কমপিটিশনে জিতেও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই পড়াশুনোর তাগিদে সে সব ছেড়ে ভাল ছাত্র হয়ে গেল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। ফার্স্টক্লাস

পেল, এম এসসিতেও তাই। কিছুদিন বোম্বাই গিয়ে চাকরি করল। সেখান থেকে গেল বিলেত, বিলেতে নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে কিছুদিন ভুগে ছমাস বাদে ফিরে এল। বলল, বিলেত কি আমাদের পোষায়! টাকাটাই গচ্চা।

ছটকু বড়লোকের ছেলে। তার বাবা সরকারি ঠিকাদার, জাহাজের মাল খালাস করার ব্যবসাও আছে। এলাহি বাড়ি, এলাহি টাকা। বিলেত থেকে ফিরে এসে ছটকু কলকাতায় চাকরি নেয়। গগন কিছুদিন আগে খবর পেয়েছে যে ছটকু চাকরি ছেড়ে ব্যাবসা করছে, খুব বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং বউয়ের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছে না।

কোনও মানুষই নিখাদ সুখে থাকে না। পৃষ্ঠব্রণ একটা না একটা থাকবেই। ভেবে গগন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ট্যাক্সিওলাকে বলল, ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস।

.

ছটকুদের বাড়িটা এত রাতেও জেগে আছে। পুরোটা জেগে আছে বললে ভুল হবে। দোতলা-তেতলার বেশির ভাগই অন্ধকার। তবু দুচারটে জানালায় আলো জ্বলছে। দোতলার বাঁ-দিকের কোণের ঘরটা ছটকুর। তাতে আলো দেখা যাচ্ছে। সদরটা খোলা। দুটো দারোয়ান বসে কথা কইছে।

গগন ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে সদরে উঠতেই দারোয়ানদের একজন বলে ওঠে, কাকে চাইছেন?

ছটকু আছে?

আছে।

একটু ডাকবে ওকে? বড় দরকার। বলো গগন এসেছে।

দেখি- বলে দারোয়ান ভিতরে গেল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করতে হল। হঠাৎই পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছটকু দরজায় দেখা দিয়ে অবাক হয়ে বলে, তুই কোত্থেকে রে?

কথা আছে। রাতের মতো একটু থাকতে দিবি?

হোল লাইফ থেকে যা না। আয় আয়।

গগন শ্বাস ফেলে বাঁচল। ছটকুর বউকে সে চেনে না। সে মহিলা কেমন হবে কে জানে! যেখানে মহিলারা সুবিধের নয় সেখানে থাকা জ্বালা। তার ওপর ছটকুর সঙ্গে তার বউয়ের বনিবনা নেই বলে শুনেছে। তাই স্বস্তির মধ্যেও একটু কাটা বিধে রইল মনে। নিখাদ সুখ বলে তো কিছু নেই।

ছটকুর পিছু পিছু দোতলায় উঠে এল গগন। এ বাড়িতে সে আগেও এসেছে। বড়লোকদের বাড়ি যেমন হয় তেমনি সাজানো। যেখানে কার্পেট পা নেই সেখানকার মেরে এত তেলতেলে আর ঝকঝকে যে পা পিছলে যেতে পারে।

ছটকুর ঘর তিনটে। কোণেরটা শোওয়ার। কহে বিশাল একটা বার ঘর। বাঁ দিকেরটা স্টাডি। বরাবর নিখানা ঘর ষ্টকু এক ভোগ করেছে। এ সব দেখে নিজের গ্যারেজের ঘরখানার কথা ভাবলে গগনের হাসি পায়। মানুষে মানুষের পার্থক্য কী বিপুল অমান-জমিন!

বসবার ঘরে মেঝে-ঢাকা পু উলের গলচে। গাঢ় নরপি রঙের। দারুণ সব সোফা আর কৌচ, বিশাল রেডিয়োগ্রাম, টি ভি সেট, বুকে,কের সে। দরজায় দার বদলে লম্বা। হয়ে ঝুলছে সুতোয় গাঁথা বড় বড় পুঁতির মালা।

ছটকু তাকে বসিয়ে একটা চাকা লাগানো পোর্টেবল রুম এয়ারকন্ডিশনারকাছে টেনে এনে চালু করল। হিমঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল গগরে শরীরে। বড় ভাল হওয়াটা।

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা মেয়ে রেখে গগন একটা আরামের আ শব্দ করে চোখ বুজে থাকে। মুখোমুখি বসা ছটকু কিন্তু একটা প্রশ্নও করেনি। চুপরে বসে একটা পাইল ধরিয়ে টানতে লাগল, সময় দিল গগনকে।

গগন খানিক বসে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারল যে এবার তার কিছুকলা উচিত। ছটকুকী ভাবছে?

গগন বলে, তোর বউ ঘুমিয়েছে।

কেন?- ছটকুর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

না, বলছিলাম কী পাশের ঘরে উনি এখন ঘুমিয়ে আছে আর আমরা কথাবার্তা বলছি, এতে ওঁর ডিসটার্ব হতে পারে।

নিভন্ত পাইপটা আবার ধরিয়ে ছটকু মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোয়নি, একটু আগেই কথা হচ্ছিল।

গগন আড়চোখে দেখে পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। জোরালো আলো নয়, মিষ্টি একটা হলুদ আভার বাতি। শোওয়ার ঘরের দরজায় ফুটফুটে সাদা জালি পরদা ঝুলছে। ওপাশে যে মহিলা আছেন তিনি গগনকে কী চোখে দেখবেন সেইটাই সমস্যা।

গগন বলল, একটু বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি।

ছটকু হেসে বলে, গগ, বিপদটা একটু নয়। একটু বিপদে পড়ে এত রাতে তুই আসিসনি।

বরাবরই ছটকু তাকে গগ বলে ডাকে। প্রথম জীবনে ছটকু তার নাম দিয়েছিল গগ্যা। গগন থেকে গগ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত আঁকিয়ে গগ্যাঁর সঙ্গে নান মিলিয়ে। পরে আর-এক আর্টিস্টের নামের সঙ্গে মিলিয়ে গগ বলে ডাকত। ই ওই স্বভাব, যে অরও নাই খানিকটা পালটে বা বিকৃত করে ডাকবে।

গগন রুমালে মুখ-গলা মুছে বলল, বিপদটা কঠিন বলে মনে হয় না। তবে আমার একজন হিতৈষিণী আমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছে।

হিতৈষিণীটি কে?

ল্যান্ডলর্ডের বউ। নাথিং রোমানটিক।

অ। আর বিপদটা?

একটা খুনের ব্যাপার।

খুন! বলে ভ্রূ তোলে ছটকু

গগনের হাসি আসে না, তবু দাঁত দেখিয়ে গগন বলে, খুন কি না জানি না। তবে কেউ কেউ বলছে খুন। আর তাতে আমাকে ফাঁসানোর একটা চেষ্টা হয়েছে।

ছটকু কী একটা বলতে গিয়েও হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে সামলে গেল। কিছু একটা টের পেয়েছিল ছটকু। কারণ কথাটা গগন শেষ করার পরপরই শোয়ার ঘর থেকে একটি মেয়ে বাতাসে ভেসে আসবার মতো এ ঘরে এল। ভারী উদাসীন নিশব্দ আর অনায়াস হাটার ভঙ্গি;

এত সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গায়ের রং, তেমনি ফিগার আর মুখখানা। এইসব মুখের জন্য দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। লম্বাটে, পুরন্ত, ধারালো সুন্দর সেই মুখশ্রী, ভারী দুখানা চোখের পাতা আধবোজ। অল্প একটু লালচে চুলের ঢল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা, পরনে একটা রোব।

ঘরে ঢুকে গগনের দিকে দু-এক পলক নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকে মেয়েটি। ঘরটা এক সুগন্ধে ভরে যায়।

ছটকু ওর দিকে পিছন ফিরে বসে ছিল। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, লীনা, এ আমার বন্ধু গগন চৌধুরী।

লীনা কথা বলল না। তবে একটু কুঁচকে বলল, নাইস টাইম ফর এ ফ্রেন্ড টু কল।

ছটকু সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলে, লিভ ইট।

লীনা বসবার ঘরের পিছনে বড় পরদার ওপাশে আড়ালে চলে যায়।

ছটকু আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, কী খাবি? খাব?

–গগন অবাক হয়ে বলে, খাব কী রে?

না খেয়ে থাকবি নাকি? না কি লজ্জাটজ্জা পাচ্ছিস?

বাস্তবিক গগন লজ্জা পাচ্ছিল। সঙ্গে আবার একটু ভয়ও। এইমাত্র ছটকুর বউ লীনা অ্যায়সা দারুণ অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বুলি বেড়েছে যে তাতেই গগন থমকে গেছে, ইংরিজিটা তো মেমসাহেবের মতো বলেই, তার ওপর মেজাজও সেই পরদায় বাঁধা। তাই গগন বড় ভিতু সিতু হয়ে পড়েছে।

ছটকু একটু হাসল। বরাবর ছটকুর মাথা ক্ষুরের মতো ধারালো। টক করে অনেক কিছু বুঝে নেয়। গগনের ব্যাপারটাও বুঝে নিয়ে বলল, ঘাবড়াচ্ছিস? কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার ঘর এটা, আমিই মালিক। তোর কে কী করবে?

গগন বলে, আরে দূর! ও সব নয়। আমার খিদেও নেই।

অত বড় শরীরটায় খিদে নেই কী রে? দাঁড়া, ফ্রিজে কিছু আছে কি না লীনাকে দেখতে বলছি।

এই বলেই বেশ গলা ছেড়ে দাপটে হাক দিল ছটকু, লীনা! এই লীনা–

অত্যন্ত ভয়াবহ মুখে লীনা পরদা সরিয়ে দেখা দেয়। চুলের একটা ঝাপটা তার অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে, চোখে সাপের চাহনি, মাথাটা এক বার ঝাঁকিয়ে বলে, চেঁচিয়ে কি নিজেকে অ্যালার্ট করতে চাইছ? কী বলবে বলো।

ছটকু সুখে নেই তা গগন নিজের দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যেও বুঝতে পারে। মেয়েছেলেরা অ্যায়সা হারামি হয় আজকাল!

ছটকু গম্ভীর মুখে কিন্তু ঠান্ডা গলায় বলে, গগনকে কিছু খেতে দাও।

লীনা খুব অবাক হয়ে গগনের দিকে তাকায়। এত রাতে একটা উটকো লোক এসে খেতে চাইবে এটা যেন কল্পনার বাইরে।

গগন মিন মিন করে বলল, না,না, আমার কিছু লাগবে না।

লাগবে- ছটকু ধমক দেয়।

লীনা অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে খুব চাপা সরু গলায় বলে, তা সেটা আমাকে হুকুম করছ কেন? বেল বাজালেই সামু আসবে। তাকে বলো।

বেলটা তুমিই হয় বাজালে!

গগন না থাকলে লীনা আরও ঝামেলা করত। সেটা গগন ওর চোখের ঝজালো কটাক্ষেই বুঝল। কিন্তু মুখে কিছু না বলে দেয়ালের একটা বোম একবার টিপে দিয়ে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

ছটকু গগনের দিকে তাকিয়ে একটু যেন জয়ের হাসি হাসে। তবে হাসিটাতে বিষ মেশানো। আবার নিভে যাওয়া পাইপ ধরায়। বলে, বেশ আছি।

গগন একটু ঘামে। এয়ারকুলার যথেষ্ট ঠান্ডা হাওয়া দিয়ে তাকে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তবু গগন ঠান্ডা হচ্ছে না তেমন। পকেটে একগোছা নোট ভরে দিয়েছে শোভা।

কেন দিয়েছে, কত দিয়েছে তা ভাববার বা দেখবার সময় পায়নি গগন। তবে দিয়েছে ঠিকই। এই টাকায় গগন বরং গিয়ে একটা হোটেলে উঠলে ভাল করত। এখানে এসে উপরি ঝামেলা পোয়াতে হত না। দুটো মানুষের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে তখন তার ফাপর অবস্থা।

ধোপদুরস্ত পায়জামা আর শার্ট পরা চাকর সামু এল। ছটকুর হুকুমে তক্ষুনি গিয়ে কোত্থেকে খাবার এনে ডাইনিং হলে সাজিয়ে দিল।

ছটকুর তাড়ায় গিয়ে খেতে বসল গগন। বড়লোকের বাড়ি বটে কিন্তু এরা অখাদ্য ইংরেজি খানা খায়। এক পট সাদা মাংস দেখে সরিয়ে রাখল গগন। মাংস খায়ইনা সে। দুটো চিজ স্যান্ডউইচ ছিল মস্ত মস্ত। একখানা কামড়ে তার তেমন ভাল লাগল না। তবে টমেটো, আর চিলি সস দিয়ে কোনওক্রমে গিলল সেটা। দ্বিতীয়টা ছুঁল না। এক বাটি সবজি দিয়ে রান্না ডাল ছিল, সেটা খেল চুমুক দিয়ে।

ছটকু উলটো দিকে বসে তার খাওয়া দেখছে। সামু সম্ভ্রম নিয়ে আঁড়াল।

গগন বেসিনে হাত ধুয়ে বলল, তুই বুঝছিস না ছটকু, খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নয়।

ছটকু জবাব দেয় না। গগনকে নিয়ে ড্রয়িংরুম পার হয়ে স্টাডিতে ঢোকে। দরজা থেকেই ফিরে সামুকে হুকুম দেয়, এই সাহেবের বিছানা লাগিয়ে দাও স্পেয়ার রুমে।

স্টাডির দরজা বন্ধ করে ছটকু মস্ত সেকরেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিলবাতি জ্বলছিল বলে ঘরটা আবছা। দুটো এয়ারকুলার চালু আছে বলে বেশ ঠান্ডা। নিঝুমও বটে। এত নিস্তব্ধ ঘর গগন আর দেখেনি। মনে হয় খুব ভাল ভাবে সাউন্ডপ্রুফ করানো আছে। তা-ই হবে। দেয়ালে ছোট ছোট অজস্র ছিদ্র। রেডিয়ো স্টেশনের স্টুডিয়োতে গগন এরকম দেখেছে। একবার আকাশবাণীর বিদ্যার্থী মণ্ডলে সে স্বাস্থ্যের

বিষয়ে বলেছিল, তখন দেখেছে সাউন্ডপ্রুফ স্টুডিয়োর দেয়ালে এ রকম ফুটো থাকে। কথা বললে কোনও প্রতিধ্বনি হয় না।

এখানেও হল না। গগন বলল, তোকে খুব জ্বালাচ্ছি।

ছটকু মাথা নেড়ে বলল, না। বরং এসে আমাকে বাঁচালি। ওই ভ্যাম্পটার কাছ থেকে খানিকক্ষণ সরে থাকতে পারছি।

গগন চুপ করে থাকে। এ প্রসঙ্গটা কটু। না মন্তব্য করাই ভাল।

ছটকু বলল, এবার তোর কথা বল।

গগন কোনও ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করে না। ও জিনিসটাই তার নেই। যা করে বা বলে তা ভেবেচিন্তে গুছিয়ে। তাই খুব আস্তে আস্তে সে ঘটনাটা ছটকুর কাছে ভাঙতে লাগল।

খুব বেশি সময় লাগল না। মিনিট কুড়ি বড় জোর। ঘটনা তো বেশি নয়।

ছটকু যতক্ষণ শুনছিল ততক্ষণ তার দিকে তাকায়নি, মাথা নিচু করে ছিল। গগন থামতেই চোখ তুলে বলল, সব বলা হয়ে গেল? কিছু বাদ যায়নি তো?

না। গগন বলে।

ছটকু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বলে, ঘটনার দিন খুনের সময়ে তুই কোথায় ছিলি?

গগন এটা ভেবে দেখেনি। তাই তো! কোথায় ছিল? অনেক ভেবে বলল, সন্ধের একটু পরে জিমনাশিয়ামে ছিলাম।

আর তার আগে?

একটু বোধহয় কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম বাজারে।

কোন বাজারে?

গগন একটু চমক খেয়ে বলল, সাঁজবাজার।

সেটা তো স্পটের কাছেই।

গগনের গলা হঠাৎ শুকনো লাগছিল। নাড়ির গতি বাড়ল হঠাৎ। সে কেমন ভ্যাবলার মতো বলল, হ্যাঁ।

ছটকু একটু চিত হয়ে আবার পাইপ ধরিয়ে বলে, আবার ভাল করে ভেবে দ্যাখ। কিছু একটা লুকোচ্ছিস।

না না।– গগন প্রায় আঁতকে ওঠে। আর তার পরেই নির্জীব হয়ে যায়।

বলে ফেল গগন। ছটকু ছাদের দিকে চেয়ে বলে।

ঠান্ডা ঘরে হঠাৎ আরও ঠান্ডা হয়ে যায় গগন। উদভ্রান্ত বোধ করে। বেগমের কথা সে ছটকুকে বলেনি। নিজের চরিত্রদোষের কথা কে-ই বা কবুল করতে যায় আগ বাড়িয়ে।

গগন কথা বলে না।

ছটকু পাইপ পরিষ্কার করতে করতে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বলে, তুই তো জানিস না, আমার হাতে এখন কোনও কাজ নেই। মানে বাবা আমাকে কোনও কাজ দিচ্ছে না, মোর অর লেস তার একটা ধারণা হয়েছে যে আমি খুব অপদার্থ, বউয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করেই গোলমাল করছি। ফলে বাড়িতে এখন দারুণ অশান্তি, লীনা নাকি টের পেয়েছে যে আমি একজন বিগতযৌবনা ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের সঙ্গে শোয়াবসা করে থাকি। বাড়িতে বলেছে সে কথা।

গগন নড়ে বসে। সে সাহস পাচ্ছে।

পাইপে তামাক ভরে জ্বালিয়ে ছটকু বলে, কথাটা মিথ্যেও নয়। তবে কিনা সে মহিলাটির যৌবন এখনও যায়নি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, শরীরের সম্পর্ক হয়নি এমন নয়, তবে কোনও সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট নেই। প্রেম-ট্রেম তো নয়ই। জাস্ট এ সর্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ। উঁচু সমাজে খুব চলে এটা। নাক সিঁটকোবার কিছু নেই। তা ছাড়া বিয়ের পর মেয়েটির সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ইনি। কিন্তু লীনা সেটাকে ঘুলিয়ে তুলছে।

মেয়েটি কে?

তুই চিনবি না, পঞ্চাশের ডিকেডে ফিল্মে নামত। তেমন নাম-টাম করেনি। যা বলছিলাম, এ সব কারণে আমার অবস্থাটা খুব খারাপ ফ্যামিলিতে। অলমোস্ট জবলেস ভ্যাগাবন্ড, বউয়ের সঙ্গে শুই না। কিছুদিন মদ খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওটা আমার স্যুট করে না একদম। বদহজম আর অ্যাসিড হয়ে অসম্ভব কষ্ট পাই। একজন বন্ধু জুটে কিছুদিন ড্রাগের নেশা করাল, খুব জমেছিল নেশাটা, বাবা নার্সিংহোমে ভরতি করিয়ে কিওর করাল। শেষ পর্যন্ত দেখলাম সুকুমার রায়ের সেই অবস্থা। হাতে রইল পেনসিল। বউয়ের সঙ্গে বনে না, বাপের সঙ্গে বনে না, মদের সঙ্গে বা ড্রাগের সঙ্গেও বনে না, কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে।

বলে পাইপটা দেখিয়ে একটু হেসে চোখ টিপে বলে, এর মধ্যে যে টোব্যাকো রয়েছে, তাতে আছে অল্প গাঁজার মিশেল। গন্ধ পাচ্ছিস না?

না!

কিন্তু আছে। আজকাল নানা রকম নেশার এক্সপেরিমেন্ট করি। সময় কাটে না। বুঝলি গগন?

বুঝলাম।

তাই বলছিলাম তোর সব কথা আমাকে বল। তোকে নিয়ে আর তোর প্রবলেম নিয়ে একটু ভাবি। সময় কাটবে।

ছটকুকে গগন খুব চেনে। ও কুকুরের মতো বিশ্বাসী, কম্পিউটারের মতো মাথা ওর। ছটকুকে বক্সিং অভ্যাস করতে দেখেছে গগন। অজস্র মার খেত, মারত। রোখ ছিল সাংঘাতিক। ভিতু নয়, লোভী নয়। ওকে বিশ্বাস করতে বাধা নেই।

কিন্তু গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হাই তুলে বলল, তোকে আমার সব কথা বললাম কেন জানিস? যাতে আমাকে তোর অবিশ্বাস না হয়। বিশ্বাস কর, আমার তোকে হেলপ করতে ইচ্ছে করছে।

গগন চোখ বুজে এক দমকায় বলে উঠল, ফলির মায়ের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

ঠান্ডা মুখে কথাটা শুনল ছটকু। একটু সময় ছাড় দিয়ে ঠান্ডা গলাতেই প্রশ্ন করে, ফলির মা কে?

ও, সে একজন সোসাইটি লেডি।-গগন আবার চোখ বুজে বলে।

সোসাইটি লেডি? তার সঙ্গে তোর দেখা হল কোথায়?

হয়ে গেল।

হয়ে গেল মানে? তোর কাছ থেকে সে পাবে কী? সোসাইটি লেডি বলতে আমরা অন্য রকম বুঝি। একটু নাক-উঁচু স্বভাবের, সিউডো ইনটেলেক্ট-ওলা মহিলা। এরা জেনারেলি হাই ফ্যামিলির মেয়ে। যেমনটা একদিন লীনা হবে।

গগন নিজের হাতের ঘাম প্যান্টে মুছে বলে, এও অনেকটা সে রকম, তবে হাই ফ্যামিলির নয়, স্বামী সামান্য চাকরি করে।

খদ্দের ধরে পয়সা নেয় নাকি?

না বোধহয়। তবে প্রেজেন্টেশন নেয়, সুবিধে আদায় করে, ধারও নেয়।

ছটকু হেসে বলে, তা হলে হাফ-গেরস্ত বল। ও সব মেয়েকে আমরা তাই বলি। সোসাইটি লেডি অন্য রকম, যদিও জাত একই। তোর কাছ থেকে কী নিত?

কী নেবে? আমার আয় তো জানিস। চাইলেও দিতে পারতাম না। তবে চায়নি।

শুধু শরীর?

শুধু তাই।- গগন লজ্জা পেয়ে বলে।

ছটকু চিন্তিত হয়ে বলে, ও সব মেয়ে তো ভাল তেজি পুরুষ বড় একটা পায় না। যারা আসে তারা প্রায়ই বুড়ো-হাবড়া কামুক,নইলে নভিস। তাই তেমন পুরুষ পেলে বিনা পয়সায় নেয়। নিতান্ত শরীরের স্বার্থে। তারপর কী হল?

কিছুদিন পর ফলির মা বেগম আমাকে রিজেক্ট করে দেয়। গেলে আর খুশি হত না আগের মতো। আমি কিন্তু ওকে দারুণ ভালবেসে ফেলেছিলাম।

বুঝেছি।

মনে মনে বেগমের জন্য খুব ছটফট করেছি বহু দিন। এখনও করি। যাই হোক, ফলি যেদিন মারা যায় তার দিন দুই আগে বেগমের একটা চিঠি পাই। তাতে ও লিখেছিল, একটা বিশেষ দিনে সন্তোষপুরের একটা ঠিকানায় গিয়ে যেন দেখা করি ওর সঙ্গে। খুব জরুরি কথা, যেদিনের কথা লিখেছিল সেটা ছিল খুনের তারিখটাই।

বেগমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

না। সে ঠিকানায় গিয়ে আমি বুড়বাক। সেখানে বউ-বাচ্চা নিয়ে এক প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার দিব্যি সংসার করছে। বেগমের কথা তারা জানে না।

বেগমের হাতের লেখা তুই চিনিস?

না।

তবে বুঝলি কী করে যে বেগম লিখেছিল?

অবিশ্বাসের তো কিছু ছিল না!

যাক গে। তারপর কী হল?

কী হবে? ওকে না পেয়ে ফিরে এলাম।

কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আসবার পথে?

গগন চুপ করে থাকে। বলা উচিত হবে কি? অথচ নাবলেই বা গগন পারে কী করে? এত দুর এগিয়ে আবার পিছোবে?

গগন চোখ বুজে বলে, ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

এ কথায় ছটকুও যেন চমকে যায়। তবে গলার স্বরটা খুবই ঠান্ডা রেখে বলে, কোথায়?

বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল। আমাকে দেখে উঠে আসে।

কথা যা হয়েছিল তা মিঠে বা মোলায়েম নয়। একসময়ে সে আমাকে একলব্যের মত ভক্তি করত, কথায় কান দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেদিন সে হুট করে বেরিয়ে এসে আমার রাত আটকে বলল, গগনদা, আপনার সঙ্গে কথা আছে। তার মুখ-চোখ দেখে আর গলার স্বর ওনে আমি চমকে গিয়েছিলাম। একটু যে ভয়ও খাইনি তা নয়। কে-জায়গায় হঠাৎ ও রকম সিচুয়েশন হলে যা হয়। আমতা আমতা করছিলাম, কারণ মনে পাপ। আমি

এসেছিলাম ওর মার চিঠি পেয়ে দেখা করতে, সেটা তো ভুলতে পারছি না। ও আমাকে একটা দোকানঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে সোজাসুজি বলল, আমার মার সঙ্গে আপনার খারাপ রিলেনি আছে আমি জানি, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। ঠিক এ ভাষায় বলেনি, তবে সেটা এই রকমই। তখন আর গগনদা বলে ডাকছিল না।

মারধর করার চেষ্টা করেছিল?

হ্যাঁ, দু-চারটে কথা চালাচালি হল। আমি দুম করে বলে বসলাম, বেগম কি আমার জন্যই নষ্ট? ওর তো অনেক খদ্দের, খোঁজ নিয়ে দেখোগে। আমি আবার মিথ্যে কথাটথা বানিয়ে গুছিয়ে বলতে পারি না। বেগমের সঙ্গে আমার রিলেশনটা যে অন্য রকম যে কোনও লোক হলে তা দিব্যি বানিয়ে-ছানিয়ে বলত। আমি পারিনি। যা হোক, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেমক্কা একটা পিস্তল বের করল পকেট থেকে। ওর চোখ দুটো তখন পুরো খুনির। দোকানের পিছনের সেই জায়গাটা আবছা অন্ধকার মতো। সেই আবছায়ায় দু-চারজন যে গা-ঢাকা দিয়ে দেখছে তা বুঝতে পারছিলাম। তাদেরই একজন এ সময়ে বলে উঠল, ফলি, চালাস না। স্টিল ভরে দে। ফলি তাতে দমেনি। পিস্তলটা তুলে বলল, তোমাকে এইখানে নাকখত দিতে হবে, থুতু চাটবে, জুতো কামড়ে ঘুরবে, তারপর তোমার পাছায় লাথি মারব। বুঝলাম খুন না করলেও ফলি এবং তার বন্ধুরা আমাকে বেদম পেটাবে। তার আগে নানা রকম ভাবে অপমান করবে। ফলি আর আগের ফলি নেই।

তুই কী করলি?

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অতটা ভয় না পেলে আমি ফলিকে মারতাম না।

মেরেছিলি?

গগন অবাক হয়ে বলে, তুই কি বলিস, মারা উচিত হয়নি।

ছটকু দাতে দাঁত চেপে বলে, তা বলিনি। শুধু জানতে চাইছি।

গগন একটু অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে, আমিও ভেবে দেখেছি মারাটা উচিত হয়েছে কি না, কিন্তু আমার আর কী করার ছিল? বুঝি যে মায়ের নষ্টামির জন্য ছেলের অপমানবোধ হয়, হতেই পারে। কিন্তু ফলির মাকে তো আমি নষ্ট করিনি, কোনও দিনই আমি মেয়েমানুষের পিছনে দুরি না, কিন্তু বেগম আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। তার জন্য ফলি খামোখা আমার উপর শোধ নেবে আর আমি দাঁড়িয়ে মার খাব নাকি? তা ছাড়া তখন প্রাণের ভয়।

কী করলি?

ফলি চোখেই দেখতে পেল না কী ওর মুখে গিয়ে লাগল, খুব কুইক ঝেড়েছিলাম ঘুষিটা। ফলি অ্যাই জোয়ান। সহজে কাবু হওয়ার মাল নয়, তার ওপর হাতে পিস্তল ছিল। কাজেই সে ছিল নিশ্চিন্ত। আশেপাশে বন্ধুবান্ধুবও রয়েছে। ভয় কী? তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় আচমকা ঘুসি খেয়েই টলে পড়ল সামারসল্ট হয়ে। আমি দুই লাফে বেরিয়ে বাজার ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসি।

তা হলে তোকে অনেকে দেখেছিল তখন।

দেখাই স্বাভাবিক। দোকানে লোক ছিল, বাজারে তো তখন গিজগিজ করছে।

কেউ তোর পিছু নেয়নি?

না।

তারপর কী করলি?

সোজা জিমনাশিয়ামে চলে যাই।

ছটকু আবার পাইপ ভরে বলে, রিকশাওয়ালা কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল গগন?

গগন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর যেন ছিপি খুলে সোডার বোতলের গ্যাস বের করে দেয়, আস্তে করে বলে, জানি না।

এমনিতেই শব্দহীন ঘর। তার ওপর যেন আরও ভারী এক নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ছটকু গগনের চোখে চোখ রেখে চোখাদৃষ্টিতে কী একটু দেখে নেয়। তারপর গম্ভীর মুখেই বলে, ঠিক বলছিস?

গগন ভাবছে, ছটকু শালা কি আমাকেই সন্দেহ করছে? করারই কথা অবশ্য। ঘটনা যা ঘটেছে তার সবকিছুই আঙুল তুলে তাকেই দেখাচ্ছে।

গগন ছটকুর চোখের দিকে আর না-তাকিয়ে বলে, আমি টাকা দিইনি। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্য হয়তো কখনও কালুকে টাকাটা দেব। যদি তাতে মেটে!

মিটবে না। ছটকু বলে।

গগন বলে, বিশ্বাস কর, ফলিকে একটা ঘুসি মারা ছাড়া আর-কিছু করিনি। এক ঘুসিতে মরার ছেলে ফলি নয়। পরে আর-কেউ লাইনের ধারে ফলিকে মারে।

ছটকু খুব বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, দ্যাখ গগন, যে মানুষ জীবনে একটাও খুন করেছে তাকে চোখে দেখেই আমি চিনতে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ইনস্টিংট আছে। এ ব্যাপারে কখনও ভুল হয় না আমার। তুই যদিও কখনও ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় কাউকে খুন করে থাকিস, তবে তোকে প্রথম দেখেই বুঝতে পারতাম। কিন্তু এটা খুবই সত্যি কথা যে তোর চেহারায় খুনির সেই অবশ্যম্ভাবী ছাপটা নেই।

গগন নিশ্চিন্ত হল কি? বলা যায় না, তবে সে এবার কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে দম নিল। বলল, আমি যে খুন করিনি তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! কিন্তু লোকে কি তা বিশ্বাস করবে? সকলের তো আর তোর মতো ইনস্টিট নেই।

ছটকু একটু হাসে। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, ফলি যে লাইফ লিড করত তাতে যে-কোনও সময়ই তার খুন হওয়ার বিপদ ছিল। এ নিয়ে ভাবিস না। কাল থেকে আমি তোর ব্যাপারটা নিয়ে অ্যাকশনে নামব। সকালে কটায় উঠিস?

খুব ভোরে। চারটে-সাড়ে চারটে।

ছটকু একটু ভেবে বলে, আমি উঠি ছটায়, কিন্তু কাল থেকে আমি তোর মতো সকালে উঠব। মনে হচ্ছে, একটু একসারসাইজ দরকার। সকালে উঠে দৌড়োবি?

নয় কেন?

দৌড়ের পর দুজনে একটু কসরতও করা যাবে, কী বলিস?

গগন হাসে। বলে, ঠিক আছে।

৯. বেগম অঝোরে কেঁদেছে

অনেক রাত পর্যন্ত বেগম অঝোরে কেঁদেছে পুত্রশোকে। নরেশ পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে আনে। বড় ডোজের সেডেটিভ ইনজেকশন দেওয়ার পর বেগম ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক বেলা। অবধি সে ওঠেনি।

নরেশ সারারাত ঘুমোয়নি। কখনও কেঁদেছে, কখনও পায়চারি করেছে ঘরে বা ছাদে। শোভা তার তীব্র জ্বালাধরা দুখানা চোখে দেখেছে সবই, সেও ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝে বিছানায় গেছে, আবার উঠেছে, দেখেছে, তারপর আবার শুয়েছে। বিছানা খুব তেতে যাচ্ছিল বার বার। কী এক জ্বালায় তার নিজের শরীর আর আসএত গরম যে বিছানায় শরীর রাখতে পারছে না। সোফা কৌচে বসতে পারে না। নরেশের সঙ্গে মুখোমুখি কথাও হচ্ছিল না তার। দুজনেই দুজনকে এড়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে শোভা গিয়ে ঘুমন্ত বেগমকে দেখেছে। চোখের কোলে এখনও জল বেগমের, চুল উসকোখুসকো, একটু বুড়োটে হয়ে গেছে মুখের শ্রী, তবু এখনও বেগম হাড়জ্বালানি সুন্দরী। শোভার ইচ্ছে করে ওকে বিষ দিয়ে মারতে। চিরকাল খোলাখুলি পুরুষদের নাচাল বেগম। কত মেয়েমানুষের স্বামী কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করেছে। নরেশ হল বেগমের ভেড়ার পালের একজন।

শেষরাতে যখন আকাশের তারা ফিকে হচ্ছে তখন শোভা আর থাকতে না পেরে ছাদের সিঁড়িতে গিয়ে নরেশকে ধরল।

তুমি ভেবেছটা কী, অ্যাঁ?

নরেশ তার দিকে খুব আনমনে চেয়ে রইল। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, তুমি বিছানায় যাও।

কেন যাব? তোমার হুকুমে?

আমার মন ভাল নেই। একা থাকতে দাও।

মন ভাল নেই কেন? ফলির জন্য?

নরেশ বলে, শোভা, তুমি মানুষ নও? ফলি কি তোমার কেউ নয়?

শোভা খুব খনখনে পেতনির হাসি হেসে বলে, ওমা! সেকথা কি বলতে আছে? ফলি যে আমার বুকের ধন, কোলের মানিক! লজ্জা করে না তোমার?

কী বলছ?

কী বলছি বুঝতে পারছ না, ন্যাকা।

পারছি না।

আমি জানতে চাই শালির ছেলের জন্য তোমার অত ভেঙে পড়ার কী? দয়া করে রহস্যটা বলবে, না কি আমার মুখ থেকে শুনবে?

নরেশ গুম হয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, এ সময় রাগারাগি থাক, তুমি শুতে যাও।

আমি শোব না। সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে আগে শুনি, তারপর কী করবনা করব তা আমি জানি।

আমার কিছু বলার নেই।

ফলি কার ছেলে, তাও ঠিক জানো না?

নরেশ চুপ করে থাকে।

শোভা আবার সেই পেতনির হাসি হেসে মোটা শরীরে হিল্লোল তুলে বলে, আমার গর্ভে হয়নি বটে কিন্তু বেগম হারামজাদির পেটে ফলি এসেছিল কী করে তা আজ স্বীকার হও না কেন?

তুমি যাবে?

জবাবটা এল অপ্রত্যাশিত একটা প্রচণ্ড চড় হয়ে। মোটা হলেও শোভার হাজারটা ব্যামো। হার্ট খারাপ, প্রেসার বেশি, মেয়েমানুষি রোগও অনেক, তা ছাড়া আরামে আয়েসে থেকে শরীর অকেজো। চড়টা লাগতেই চার ধাপ সিঁড়ি টপকে অত বড় লাশটা পড়ল সিঁড়ির মোড় ঘোরার চাতালে। বাড়ি কেঁপে গেল তার পড়ার শব্দে।

১০. জায়গাটা গরম

বাড়িতে ঢুকেই কালু বুঝতে পেরেছিল, জায়গাটা গরম আছে। তার মতো লোকের ঘরে ঢুকে মস্তানরা যখন হুটোপাটি করে গেছে তখন বুঝতে হবে কেস খারাপ।

মা প্রথম দিকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, একটু বাদে দম ফুরিয়ে ঘ্যাজর-ঘ্যাজর করতে লাগল।

সেদিকে মোটে কানই দিল না কালু। বলল, ফালতু বাত ছেড়ে কাজের কথাটা বলে লে দিকি। কী হয়েছে কী?

তোকে যমে নেয় না কেন বলবি?

অরুচি বলে নেয় না। কারা এসে হান্নাক করে গেছে?

সে গিয়ে তোর পেয়ারের লোকদের জিজ্ঞেস কর গে। আমি কি সবাইকে চিনে রেখেছি? নাহক হাবুকে আর ভুতুকে ধরে এই মার কি সেই মার! কেবল জিজ্ঞেস করে, কালু কোথা বল। আমি ঠেকাতে গেলাম তো আমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কনুই ছড়ে এখনও রক্ত পড়ছে।

হাবু ভুতু কই?

তারা থানায় গেছে।

কালুর মাথাটা ঠিক নেই। বড্ড ঘোট পাকাচ্ছে চার দিকে। বলল, কাউকে চিনতে পারিসনি?

হাবু বলছিল একজন নাকি বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে সুরেন খাঁড়া না কে যেন!

কালু সময় নষ্ট করল না। সোজা উঠোনে গিয়ে কচুগাছের গোড়ার মাটি খামচে তুলে ফেলল। তলায় একটা প্লাস্টিকের খামে তার টাকা। সেটা তুলে পকেটে পুরে সে গিয়ে মাকে বলে, আমি পাতলা হচ্ছি। খুঁজিস না। বাড়িতে থাকলে শালারা আবার আসবে।

কী করেছিস বল! নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

চেঁচাস না। জানাজানি হলে আমিও যাব, তুইও যাবি।

ভয় পেয়ে মা চুপ করে যায়।

কালু অপথ কুপথ ঘুরে স্টেশনে চলে আসে। বিশে গনগনে আঁচে বেগুনি ভাজছে। কালু গিয়ে সোজা সেখানে বসে পড়ে বলে, গাড়ায় পড়ে গেলাম।

বিশে এক খদ্দেরকে বিদেয় করে বলে, আজ মাল খাওয়াবি বলেছিলি।

মাইরি খাওয়াব। আমাকে দু-একদিন থাকতে দিবি?

বিশে হেসে বলে, থাকার জন্য স্টেশন আছে।

কালু মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক।

গাড্ডা কী?

বাড়িতে হামলা করছে শালারা।

কারা?

আছে।

রামরতন রিকশাওয়ালা চপ কিনতে এসে কালুকে দেখে হাটুর গুতো দিয়ে বলে, অ্যাই শালা! তোকে নাকি স্বশুরবাড়ি ঘুরিয়েছে?

কালুর মেজাজ ভাল নেই। উঠে সটাং করে এক চড় কষাল রামরতনের গালে। বলল, জল ভরে দেব শালা। গেলবারে গুপ্তর দোকানের মাল সরিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ি ঘোরোনি?

রামরতন বেশি ঘাটাল না। কালু একা নয়, বিশে আছে। বিশে মহা মারকুট্টা ছোকরা। স্টেশন্পে ভিখিরিদের দঙ্গলটা দরকার মতো বিশের পক্ষ নেয়। বিশে ওদের ভাজা বেসনের কুঁড়ো আর নিংড়ানো মুড়ি দিয়ে হাতে রাখে। তাই রামরতন গালে হাত বুলিয়ে বলল, খচছিস কেন?আমিশালা ভাল কথা বলতে গেলাম।

কালু আর বসল না। বিশেকে বলল, আমি সাঁজের পর আসব।

বিশে মাথা নাড়ে।

কালু স্টেশন রোড ধরে সোজা হাঁটা দেয়।

ঘুরে-ফিরে কোথাও যাওয়ার নেই দেখে সন্তুদের বাড়ির কাছে চলে আসে কালু। এসে দেখে নরেশবাবুদের বাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। দোতলা থেকে নরেশের মোটা গিন্নির চেঁচানি আসছে, সব জানি, সব জানি। ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলব তোমার চরিত্রের কথা।

সন্তু নীচের তলায় ছিল। কালুর এক ডাকে বেরিয়ে এসে বলল, চল। তোর সঙ্গে কথা আছে।

দুজনে সিংহীদের বাগানে ঢুকে পড়ে।

সবেদা গাছটা ন্যাড়া করে ফল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। সেই গাছের তলায় বসেস গম্ভীর মুখে বলে, তুই এ রকম ডে-লাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

তাতে তোর বাবার কী?

মুখ খারাপ করিস না কালু।

কালু হেসে বলে, রং লিস না সন্তু। আমি কাউকে ভয় খাই না।

সন্তু কালুর দিকে ভ্রু কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে, যখন প্যাদানি খাবি তখন বুঝবি।

কালু বলল, ছোড় বে।

সন্ত চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, ঠিক আছে। তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।

আমার ভাল নিয়ে তোর মতো ভদ্রলোকদের ভাবতে হবে না। আগে বল কী বলতে চেয়েছিলি।

সন্তু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে। তুই পুলিশকে গগনদার নাম বলেছিস?

আমি বলব কেন?

তবে কে বলেছে?

তার আমি কী জানি? গগনদাকে ফাঁসিয়ে আমার কী লাভ?

কিন্তু সবাই জানে তুই গগনদার নাম বলেছিস। গগনদা কাল পালিয়ে গেছে।

কালু এটা জানত না। একটু থমকে গিয়ে একগাল হেসে বলে, লাগ ভেলকি লাগ। খুব জমে গেল মাইরি।

সন্তু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ কালু মুখ গম্ভীর করে বলল, সুরেন শালাকে আমার বাড়ি চোল কে বল তো?

তার আমি কী জানি!

জানিস না?

আমি জানব কী করে?

আমার বাড়িতে সুরেন গিয়ে হামলা করেছে কেন তা জানিস?

সন্তু স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু খুব তেজের গলায় বলে, ও সব আমার জানার কথা নয়।

সুরেন আমার কাছে কী চায় তাও জানিস না?

না।

এর আগেও সুরেন আমাকে একবার মেরেছে। শালা জানে না, কালু রিকশাওয়ালা হলেও মেড়া নয়। শালার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ও সব আমাকে বলছিস কেন?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ সুরেনকে আমার বাড়ির পাত্তা লাগিয়েছে। নইলে আমার বাড়ি নোর কথা ওর নয়।

আমি ঠিকানা দিইনি।

কালু খুব হীন চোখে সন্তুর দিকে চেয়ে বলে, কাল তুই আমাকে ছোরা চমকেছিলি, মনে আছে?

সন্তু জবাব দেয় না। অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

কালু বলে, আমি কিছু ভুলি না।

সে তোকে মারার জন্য নয়। ভয় দেখানোর জন্য!

কালু হাত বাড়িয়ে বলে, ছুরিটা দেখি।

কাছে নেই।

কালু এক্কেবারে আচমকা লাফিয়ে উঠে পটাং করে একটা লাথি লাগাল সন্তুর থুতনিতে। লাথিটা তেমন জোরালো হল না। কালুর শরীরে এখন আর তত তেজ বল নেই। সন্তু শালা ভাল খায়-দায়, গগনের কাছে ব্যায়াম শেখে। শক্ত জান, তবু আচমকা লাথি খেয়ে মুখ চেপে মাটি ধরে নিল।

কালু সময় নষ্ট করে না। পড়ে-থাকা সন্তুর প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে মালটা বের করে ফেলে। বিলিতি ছুরি, কল টিপলে ছ ইঞ্চি ইস্পাত বেরিয়ে আসে পটাং করে।

সন্তু যখন উঠল তখন কার হাতে ফলাটা জমে গেছে। চকচক করছে রোদে। কালু বলল, দেখ শালা, আমার জানের পরোয়া নেই। দরকার হলে আমি লাশ ফেলব। ঠিক করে বল, সুরেনকে কে আমার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে।

দাত বসে গিয়ে সন্তুর ঠোঁট ফেটে হাঁ হয়ে আছে। অঝোর রক্ত। হাতের পিঠে ক্ষতস্থান মুছে নিজের রক্ত দেখল সত্ত্ব। তারপর খুব ঠান্ডা চোখে চাইল কালুর দিকে!

কাল কখনও ছুরি চালায়নি, সন্তু জানে। এও জানে, কালুর শরীরে কিছু নেই। তবে রোখ আছে।

হিসেব করতে কয়েক পলক সময় নিল সন্তু। গগনের কাছে সে বিস্তর পাঁচ শিখেছে।

সন্তু কী করল তা চোখে ভাল দেখতেও পেল না কালু। কিন্তু হঠাৎ টের পেল তার ছুরির হাতটা মুচড়ে ধরে সন্তু তাকে উপুড় করে ফেলেছে। পিঠে হাঁটু চেপে বসিয়ে মাথাটা ঠুকবার তাল করছে মাটিতে।

কালুর লাগে না। মারধর সে বিস্তর খেয়েছে। প্রায়ই খায়। মুহূর্তে সে হাঁটুতে ভর দিয়ে পটাং করে শরীরটা ছুঁড়ে দিল উলটোবাগে। সন্তু ছিটকে গেল।

দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে আসে পরস্পরের দিকে। কালুর হাতে আধলা ইট, সন্তুর হাতে ছুরি।

১১. ভোরে ওঠা অভ্যাস

খুব ভোরেই উঠে পড়তে হল গগনকে। ভোরে ওঠা তার অভ্যাস, তার ওপর এখন প্রবল দুশ্চিন্তা চলছে।

বাথরুমের কাজ শেষ করে এসে যখন বাসি বিছানাটা নিজেই গোচ্ছাচ্ছে, তখন ছটকুর ঘর থেকে অ্যালার্ম বাজার শব্দ এল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ছটকু ফিটফাট হয়ে এসে গগনের দরজায় টোকা মেরে ডাকে, গগ, উঠেছিস?

উঠেছি।

চল।

গগনের মন ভাল নেই। সকালে উঠে শরীর রক্ষার জন্য দৌড়ানো বা ব্যায়াম করার মতো মন এখন তার নয় তবু ছটকুর আগ্রহে যেতে হল।

বড়লোকি সব ব্যাপার। ছটকু তার ফিয়াট গাড়ি চালিয়ে ময়দানে এল। ঘড়িতে সোয়া চারটে। ভিকটোরিয়ার সামনে গাড়ি রেখে দুই বন্ধুতে ধীরলয়ে দীর্ঘ দৌড় শুরু করে। পাশাপাশি।

গগন টের পায়, ছটকু নেশাভাং যাই করুক এখনও ওর প্রচণ্ড দম। প্রায় মাইল দুই দৌড়ের পর বরং গগনের কিছু হাঁফ ধরেছে, কিন্তু ছটকু একদম ফিট:

বাড়িতে ফিরে ছটকু গগনকে নিয়ে গেল তার জিমনাশিয়ামে। ছোটর মধ্যে এত ভাল জিমনাশিয়াম গগন চোখেও দেখেনি। প্রত্যেকটা যন্ত্রপাতি ঝা-চকচকে নতুন আর দামি। বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আনা।

ছটকু বলে, এ সব পড়েই থাকে বেশির ভাগ। আমি মাঝে মাঝে খেয়াল হলে ব্যায়াম করি।

দুজনে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা নীরবে নিখুঁত ব্যায়াম করে যায়। গগন নিজে প্রশিক্ষক, কাজেই ব্যায়ামের খুঁটিনাটি সব তার জানা। কিন্তু সেও অবাক হয়ে যায় ছটকুর নিখুঁত ব্যায়াম দেখে। কোথাও কোনও খাকতি নেই।

ব্যায়ামের পর দুজনেই গ্লাভস পরে কিছু সময় ঘুমোঘুসি করে। ছটকু খুবই ভাল লড়ে। ওর বাঁ হাতের ছোবল বিষে ভরা। গগন দুটো ভুতুড়ে ঘুসি খেয়ে গেল ছটকুর হাতে। বলল, তুই এখনও একটি বিন্দু আছিস। লড়া ছেড়ে দিলি কেন?

আরে দূর! লড়ে হবে কী?

কিন্তু এখনও তোর ঘুসিতে অনেক ব্যাপার আছে।

ছটকু গ্লাভস খুলে ফেলে উদাস মুখে বলে, কী জানিস! আসলে আমার জীবনটা তো হ্যাপি নয়। চারদিকটার ওপর আমার আক্রোশ। ঘরে একটা কালো সাপ পুষছি। কেউ আমাকে বোঝে না, আমার প্রতি কারও সিমপ্যাথি নেই। সেই সব দুঃখে, রাগ, আক্রোশ সব আমার ঘুসিতে বেরোয়।

গগন বুঝতে পারে। ছটকুর জন্য তার একটু মায়াও হয়। বড়লোকেরাও দুনিয়াতে সুখে থাকে না তা হলে!

গগনের চিন্তা ভাত কাপড় নিয়ে। অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় তার দিন ক্ষয় হয় রোজ। সে লড়াই ছটকুর নেই। তবু ভগবান ওকেও তো সুখ দেননি।

এলাহি জলখাবারের আয়োজন টেবিলে সাজানো। বেশিরভাগই ইংলিশ খানা। হ্যাম অ্যান্ড এগ, পরিজ, টোস্ট, ফল। গগন মাছ-মাংস খায় না বলে তার জন্য অনেকখানি ছানা দেওয়া হয়েছে। আর বাদামের শরবত।

গগন খুব বেশি খায় না। পেট ভার করে খাওয়া তার ভীষণ অপছন্দ। ছটকুও বেশি খেল না। সাজানো খাবারের অধিকাংশই পড়ে রইল।

ছটকু তার পাইপ ধরিয়ে বলে, তুই তো জুড়ো শিখছিলি, না?

হ্যাঁ।

আমিও শিখেছিলাম লন্ডনে।

জানি।

জুডো শেখার সময় যে শপথ করানো হয়, তা মনে আছে গগ?

আছে।

ছটকু হেসে বলে, নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরে ছাড়া কাউকে আঘাত করা যাবে না।

জানি।

আমার সে নিয়মটা প্রায়ই ভাঙতে ইচ্ছে করে। বুঝলি! আজকাল মাঝে মাঝে আমার মাথা ভিসুভিয়াস হয়ে যায়।

গগন ব্যাপারটা বুঝল না। চুপ করে রইল।

সামু খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে। আর একজন উর্দি পরা লোক কফির ট্রে নিয়ে এল।

গগন কফি বা চা খায় না। ছটকু কালো কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলে, কাল রাতে আই হ্যাড অ্যানাদার এনকাউন্টার উইথ হার।

গগন চোখ নামিয়ে নেয়। ছটকু এবং তার বউয়ের প্রসঙ্গটা বড় অপ্রীতিকর বলে তার মনে হয়। সে লক্ষ করেছেসকালে জলখাবারের টেবিলে ছটকুর বউ লীনা আসেনি। কিন্তু ভদ্রতায় বলে, আসা উচিত ছিল। তবে গগন নিজেকে খুব সামান্য মানুষ বলে মনে করে, তাই তার প্রতি কেউ তেমন সৌজন্য না দেখালেও সে কিছু মনে করে না।

কিন্তু ছটকুর বোধহয় ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। কফি আর পাইপে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে সে হঠাৎ বলল, দুনিয়ার কাউকেই ও মানুষ বলে মনে করে না। কাল রাতে আই হ্যাড টু বিট হার।

গগন ব্যথিত হয়ে মুখ তোলে। বলে, সে কী রে! মারলি?

মারতে হল। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। আই অ্যাম এ ফলেন গায়।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, আফটার অল মেয়েমানুষ তো!

তুই মেয়েমানুষ চিনিস না গগ। চিনলে অত দয়া হত না তার। মেয়েমানুষকে যারা অবলা বলে তারা অনভিজ্ঞ। ওদের মতো এত নিষ্ঠুর আর নেই।

গগন রাত্রিবেলা কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। তার ঘুম খুব চটকা। তার ওপর গতকাল সে ভাল ঘুমোয়নি। তবে কি ছটকুর ঘরটাও সাউন্ড-প্রুফ করা? কিন্তু তা হলে সকালে অ্যালার্মের আওয়াজ এল কী করে?

ছটকু অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, কিন্তু মেরেও লাভ হয় না। লীনা যেমন-কে-তেমনই থেকে যায়। তেমনি কোল্ড-রাডেড, জুয়েল, সেলফিশ, অ্যামবিশাস।

সামু সবই শুনছে। গগনের লজ্জা করছিল।

ছটকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, চল। অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া এখন আমার আর পথ নেই।

ছটকুর ফিয়াট গাড়িটা যখন প্রকাশ্য দিনের আলোয় পাড়ায় ঢুকছে তখন গগনের বুকটা একটু বেশি ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেছে।

ছটকু গগনের গ্যারাজ-ঘরের সামনেই গাড়িটা দাঁড় করাল। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে গগনের দিকে ফিরে একটু হেসে বলল, দ্যাখ গগ, তুই আর আমি একসঙ্গে বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি। সুতরাং ঘাবড়াবি না। আমার মনে হয় না কেউ তোকে খামোখা ধরপাকড় করতে আসবে।

গগন গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, তা নয়। তবে আমার লজ্জা করছে। তুই এখানে এলি কেন?

এখান থেকেই কাজ শুরু করব বলে।

বেরোবার আগে ছটকু অনেকক্ষণ টেলিফোনে যাদবপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলেছে। নিজেদের প্রতিষ্ঠার জোরে ছটকু থানা-পুলিশের খাতির পায়। সকলের সঙ্গেই তার ভাল ভাবসাব।

টেলিফোনে কী কথা হয়েছে তা গগন শোনেনি। কথা বলার পর ছটকু তাকে সংক্ষেপে জানিয়েছে, যাদবপুর থানা থেকে যেটুকু জানবার জেনে গেছি। এখন তোর কোনও ভয় নেই।

গগনের তবু ভয় যায় না।

বেলা বেশি হয়নি। দশটা বোধহয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ চার দিক পোড়াচ্ছে। ছোট গাড়িটা এর মধ্যেই তেতে ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গগনকে একটা রোদ-চশমা ধার দিয়েছে ছটকু। নিজেও একটা পরেছে। ছদ্মবেশ খুবই সামান্য। তবু হয়তো লোকের চোখ থেকে কিছুটা আড়াল করা যাবে নিজেকে।

নরেশের বাড়ির ওপরতলা থেকে শোভার প্রচণ্ড গলার শব্দ আসছে। বোধহয় সে নরেশেরই শ্রাদ্ধ করছিল, মায়ের পেটের বোন না হাতি! ঢ্যামনা কোথাকার! কার কুমে তুমি ওকে কোলে করে এনে এ বাড়িতে তুলেছ? বাড়ি আমার নামে।

জবাবে একজন পুরুষ বোধহয় কিছু বলল।

শোভার গলা তুঙ্গে উঠে যায়, বেশ করেছি তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। একশোবার দেব। নির্দোষ লোকের নামে খুনের নালিশ করেছ, তোমার নরক হবে না!..হা হা, তার সঙ্গে আমার ভাব আছে তো আছে...তোমার ভাব নেই কারও সঙ্গে? ঢলানি মাগিটার সঙ্গে তো লোককে দেখিয়েই শোয়াবসা করো।

গাড়িটা লক করতে করতে ছটকু মৃদু হেসে চাপা গলায় বলল, অ্যানাদার লীনা।

দু-চারজন লোক তাদের লক্ষ করছিল। আশপাশের জানলা দিয়ে প্রচুর উঁকিঝুঁকিও টের পায় গগন।

ছটকুর তাড়াহুড়ো নেই। ধীরেসুস্থে সে চার দিকে তাকিয়ে দেখো পাইপ ধরায়। তারপর বলে, চল।

কোথায়?

নরেশের ঘরে। বেগমকে একটু ক্রস করা দরকার।

বেগম? সে এখানে থাকে না। গগন বলে।

এখন আছে, চল।

গগনের বুক অসম্ভব কেঁপে ওঠে। পিছোনোর উপায় নেই। তবু বলল, তুই যা, আমি অপেক্ষা করি।

ছটকু ভ্রু কুঁচকে বলে, তাতে লাভ হবে না। বেগমের সামনে তোর প্রেজেন্স খুব দরকার। নইলে ও শকড হবে না। বেগমের লেখা সেই চিরকুটটা কি হারিয়ে ফেলেছিস?

গগন মনে করতে পারল না। বলল, কোথায় রেখেছি কে জানে।

কাঁধ বাঁকিয়ে ছটকু বলল, এমন কিছু এসেনশিয়াল নয়। তুই পিছনে আয়, আমি আগে উঠছি।

দোতলায় নরেশের বৈঠকখানার দরজা খোলাই রয়েছে। ভিতরের কোনও ঘর থেকে শোভার গলা আসছে, সবাইকে বলব ফলির আসল বাপ তুমি। ওই নষ্ট মেয়েটার সঙ্গে তোমার শোয়াবসা।

ছটকু খুব হাসছে শুনে।

দুবার কলিংবেল বাজানো সত্ত্বেও কেউ এল না। তিনবারের বার ঝি এসে খোটকা মুখ করে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, কী চাইছ?

ছটকু রোদ-চশমাটা এতক্ষণ খোলেনি। এবার খুলল। মুখটা ভয়ংকর গম্ভীর। চোখে ভীষণ ভ্রূকুটি। ছটকুর চোখ খুবই মারাত্মক। যখন রেগে যায় তখন তার দিকে তাকাতে হলে শক্ত কলজে চাই।

ঠান্ডা গলাতেই ছটকু নির্দ্বিধায় বলল, তোমার বাপকে চাইছি।

ঝিটা কেমনধারা হয়ে গেল। চোখেমুখে, স্পষ্টই ভয়। কথা বলল না, কিন্তু শুকনো মুখে চেয়ে রইল।

ছটকু প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল, যাও, গিয়ে নরেশবাবুকে ডেকে দাও।

ঝি চলে গেল। ছটকু নিঃসংকোচে বৈঠকখানায় ঢুকে একটা কৌচে গা এলিয়ে বসে গগনকে ডাকল, আয় গগ।

গগন খুবসংকোচের সঙ্গে ঢুকল, যেন বাঘের ডেরায় ঢুকছে। গরমে এমনিতেই তার ঘাম হচ্ছিল। এখন হঠাৎ তার সারা গায়ে ফোয়ারার মতো ঘামের স্রোত নামছে। পোশাক ভিজে যাচ্ছে, চোখে জিভে নোনতা জল ঢুকছে।

অনেকক্ষণ বাদে নরেশ এল। ভিতরে শোভার চেঁচামেচি একটু থেমেছে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছে এখনও, তবে বকবকানির।

নরেশের পরনের লুঙ্গিটা উঁচু করে কোমরে গোঁজা। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খালি গা, চোখ লাল, চুল উসকোখুসকো, যেন এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছে।

ঘরে ঢুকেই নরেশ আচমকা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল। বিস্ময়ে বোবা। চোখ পটপটাং করে খুলে অবিশ্বাসে তাকিয়ে আছে।

ছটকু উঠে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকায় নরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লোহার হাতে চেপে ধরে বলল, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। বসুন।

ছটকুর কণ্ঠস্বরে কিছু ভদ্রতা থাকলেও আচরণে নেই। সে নরেশকে ধীরে টেনে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল।

নরেশ ঝেঁঝে উঠে বলল, হাত ধরছেন কেন?

ছটকু হেসে বলে, লাগল বুঝি?

নরেশ সে কথার জবাব না দিয়ে ছটকুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এ সব কী ব্যাপার?

প্রশ্নটা গগনকে করা। নরেশ ছটকুকে চেনে না।

গগন জবাব দেয় না।

ছটকু কৌচে এলিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে বলে, নরেশবাবু, গগনকে অ্যারেস্ট করতে আপনি পুলিশ ডেকেছিলেন?

নরেশ হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, একশোবার ডাকব, শালার শুভার দল! ভেবেছ কী তোমরা? বাড়িতে ঢুকে গায়ের জোর দেখানো হচ্ছে? আঁ?

বলতে বলতে আচমকাই নরেশ বে-হেড হয়ে লাফিয়ে উঠে একটা জয়পুরি ফুলদানি তুলে তেড়ে এল গগনের দিকে, গুন্ডামির আর জায়গা পাওনি?

ছটকু হাত বাড়িয়ে নরেশের হাত টেনে ধরল এবং নিছক একটি ঝাঁকুনিতে তাকে নিস্তেজ করে আবার সোফায় বসিয়ে দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, মেইনলি আমরা বেগমের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, আপনার সঙ্গে নয়। তবে আপনাকেও দু-একটা জরুরি কথা বলা দরকার। সেটা পরেও হতে পারবে। এখন বেগমকে ডেকে দিন।

নরেশ যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়ংকর রাগী চোখে সে ছটকুকে দেখল, তারপর বলল, বেগমের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনারা বেরিয়ে যান।

ছটকু পায়ের ওপর পা তুলে বসে বলে, বেয়াদপির সময় এটা নয়। গগন আমার বন্ধু। তাকে আপনি না-হক হ্যারাস করেছেন, পেছনে পুলিশ লাগিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে রসের কথা বলতে আসিনি। বেশি তাঁদড়ামি করলে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যাব মেরে।

ছটকুর এই গলার স্বর গগনও চেনে না। খুবই ঠান্ডা গলা, কিন্তু তাতে ইস্পাতের মিশেল। যে শোনে সে জানে ছটকু প্রত্যেকটা কথাই মেপে বলছে। একটুও ভয় দেখাচ্ছে না। কিন্তু যা বলছে তা-ই করবো।

নরেশ এবার চোখ নামিয়ে বলল, বেগম ঘুমোচ্ছে।

ছটকু কিছু অধৈর্যের সঙ্গে বলল, তাকে তুলে দিন।

সে অসুস্থ। তার ছেলে মারা গেছে।

সেটা আমরা জানি। তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। ভিতরের দরজার পরদা সরিয়ে হঠাৎ শোভা ভিতরে আসে। তার চেহারাটা বড় কিম্ভুত দেখাচ্ছে। চুলগুলো পাগলির মতো উড়োখুড়ো, মুখ ফুলে রাবণের মা, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

গগনের দিকে চেয়ে বলল, আবার এসেছেন? ভাল চান তো পালান। নইলে ওই বদমাশ আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। জানেন না তো, ওর এখন পুত্রশোক।

নরেশ উঠে শোভার দিকে তেড়ে যায়। গগন আটকানোর জন্য উঠতে যাচ্ছিল। ছটকু হাত বাড়িয়ে ইশারা করায় থেমে গেল।

নরেশ তেড়ে গিয়ে শোভাকে মারল না বটে, কিন্তু জাপটে ধরে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে গেল। দরজাটা সপাটে বন্ধ হয়ে ছিটকিনি পড়ল ভিতর থেকে।

গগন অস্বস্তির সঙ্গে বলে, ছটকু চল।

ছটকু না-নড়ে বলে, দাঁড়া।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অল্প বাদেই অন্য একটা দরজার পরদার আড়ালে একটা ফোঁপানির শব্দ উঠল, হিক্কা তোলার আওয়াজ। তীব্র হতাশার গলায় কোনও মহিলা বলে উঠলেন, সব গেল রে....

ঠিক তারপরেই পরদা সরিয়ে খানিকটা টলমলে পায়ে বেগম ঘরে ঢোকে। খুবই করুণ তার চেহারা। সুন্দরী বেগমকে কে যেন চোখের জল আর শোকের শুষ্কতা দিয়ে চটকে মেরেছে। সব রূপটুকু ধুয়ে তার চেহারায় বয়সের ভাটা ফুটে উঠেছে এখন।

বেগম তার দুখানা বিভ্রান্ত চোখে গগনকে চেয়ে দেখল। যেন অনেক কষ্টে চিনতে পেরে কল, আমার ফলি কোথায় গেল?

ছটকু খুব নরম গলায় বলে, আপনি বসুন।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে-যাওয়া গলায় বেগম বলে ওঠে, হা ভগবান!

তারপর নিজের অজান্তেই বুঝি সোফায় বসে পড়ে বেগম। চোখ বুজে থাকে। চোখের পাতা ভিজিয়ে জলের ধারা নেমে আসে অঝোরে। দাতে দাঁত চেপে থাকে বেগম, শুধু থরথর করে তার রক্তহীন সাদা ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ছটকু বলে, ফলির মৃত্যুতে গগনের কোনও হাত ছিল না, বিশ্বাস করুন।

বেগম তার রক্তবর্ণ চোখে চাইল। প্রথমে কিছু বলল না। সামলাতে সময় নিল।

কিন্তু সামলে নিলেও সে। আঁচলে চোখ মুছল। অনেকক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে বলল, সেদিন..কবে যেন?

গগন বলল, পরশু।

বেগম গগনের দিকে স্থির চোখে চায়। তারপর একটু শিউরে উঠে বলে, সেদিন ফলি সন্ধের পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। বলল, গগনদা আমাকে মেরেছে। আপনি কি ওকে সত্যিই মেরেছিলেন?

গগন চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। নইলে ও আমাকে মারত। ওর হাতে পিস্তল ছিল।

বেগম ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলে, জানি। ওর কাছে পিস্তল থাকত। ইদানীং ও খুব বিপদের জীবন কাটাত। আমি ওকে মানুষ করতে পারিনি, সে পাপের শাস্তি পেলাম গগবাবু।

ছটকু নরম স্বরে বলে, কিন্তু ফলির মৃত্যুর পেছনকার ঘটনাটা আমাদের দরকার।

বেগম মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে, ফলি গগনবাবুকে মারবার জন্য প্ল্যান করেছিল। মারা মানে খুন নয়। উলটে ও নিজেই মার খায়। সন্ধেবেলা যখন আমার কাছে এল তখন ভীষণ ফুঁসছে, ও রকম রেগে যেতে ওকে আর কখনও দেখিনি।

ছটকু হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেনি সেদিন?

বেগম মুখটা নামিয়ে রেখেই বলল, হ্যাঁ। শুধু ঝগড়া নয়, আমাকেও ও মারে।

গগন অবাক হয়ে বলে, মেরেছে?

আমার ওপর ওর ভয়ংকর রাগ ছিল। যতটা ভালবাসত ততটাই ঘেন্না করত আমাকে। আমার সম্পর্কে ওর কানে কে যেন কিছু খারাপ গালগল্প বলে বিষ ঢেলেছে, সেই দিন ও আমার জবাবদিহি চায়, আমি ওকে যত শান্ত করতে চাই, ও তত রেগে ওঠে। অবশেষে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়, চড়-চাপড় মারে, গালাগাল করতে থাকে। হয়তো আরও মারত, পাড়ার লোক এসে ঠেকায়। তখন ও কার ওপর যেন শোধ নেবে বলে শাসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি তখন এত দিশেহারা যে ওকে আটকাতে পারিনি। পারলে–

ছটকু জিজ্ঞেস করে, ঝগড়া ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কোনও কথাবার্তা হয়নি?

না। সেদিন গগনবাবুর কাছে মার খেয়ে ফলি রাগে বেহেড হয়ে যায়। কেবল গগনবাবুর নামই করছিল। সেই থেকেই আমার সন্দেহ হতে থাকে

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, ভুল সন্দেহ বেগম দেবী।

বেগম ছটকুর দিকে স্থির-চোখে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তা হলে ফলিকে কে মেরেছে?

সেটা অনুমানের ব্যাপার।

ছটকু গম্ভীর মুখে বলে। তারপর পাইপ ধরায়।

অনুমানটা কী?

তার আগে বলুন এ পাড়ায় ফলি আর কার কার কাছে যেত?

আমি তা জানি না। আমার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হত না। তবে শুনেছি আমার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে মাঝে মাঝে ধার করে টাকা নিত। কিন্তু বাড়িতে আসত না। গদিতে গিয়ে দেখা করত।

আর কেউ?

বেগম ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবে। তারপর বলে, না, আর কারও নাম কখনও বলেনি।

আচমকা ছটকু প্রশ্ন করে, আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আসেননি?

বেগম অবাক হয়ে বলে, স্বামী? তিনি তো কাজে...মানে বাইরে গেছেন।

তিনি ফলির মৃত্যু-সংবাদ জানেন?

শুনেছেন।

বাইরে কোথায় গেছেন?

বলে যাননি।

তার কলেজের ঠিকানাটা দিতে পারেন?

বেগম একটু গম্ভীর মুখে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তাঁকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। ওর শরীর খারাপ, তার ওপর এই ঘটনা।

ছটকু উঠে পড়ে। বলে, আপনার এই শোকে কিছু বলার নেই। শুধু অনুরোধ, গগনকে খামোকা ঝামেলায় জড়াবেন না। গগন ফলিকে মেরেছিল বটে, কিন্তু সে আত্মরক্ষার জন্য। ও খুনে নয়।

গেম একবার গগনের দিকে তাকাল। কবে সেই ভালবাসা মরে গেছে। এখন আছে শুধু কিছু সন্দেহ আর আক্রোশ।

তবু গগন বেগমের চোখে চোখ রেখে কিছু খুঁজল কি?

১২. বিশাল কলেজবাড়ি

মধ্য কলকাতার বিশাল কলেজবাড়ির ভিতরে ফলির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করতে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আর খোঁজখবর করতে হল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি থেকে বেয়ারা প্রায় ধরে আনল অ্যাপ্রন পরা বুড়ো মানুষটিকে।

বাঁ চোখের চশমার কাঁচ ফাটা, মুখে কদিনের বিজবিজে সাদা কাঁচা দাড়ি, মোটা গোঁফ ঠোঁট ঢেকে রেখেছে। ক্ষয়া ছোট চেহারা। চোখে সন্দেহের বা কৌতূহলের দৃষ্টি নেই। একটু ভিতু ভাব। পুত্রশোক অবশ্যই তাকে স্পর্শ করেনি। নিজেই প্রশ্ন করলেন, আপনারা আমাকে কেন খুঁজছেন?

এঁকে চেনেন?– বলে ছটকু গগনকে দেখিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র গগনকে খুব ঠাহর করে দেখে বলেন, দেখেছি। ফলিকে ব্যায়াম শেখাত।

ফলি মারা গেছে, জানেন?

জানি। মহেন্দ্রর চোখে-মুখে অস্বস্তি।

আমরা ফলির বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

জানার কিছু নেই। অতি বখাটে ছেলে ছিল। মরেছে, তা সে নিজেরই দোষে।

শেষ কবে আপনার ফলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মহেন্দ্র ভেবে-টেবে বলেন, কবে যেন! পরশুই হবে।

কোনও কথা হয়নি?

যত দূর মনে পড়ে, ও খুব রেগেমেগে বাড়িতে এসেছিল। কোনও দিনই আমার সঙ্গে বনে না। ওর সঙ্গেও না, ওর মায়ের সঙ্গেও না। আমরা একটা অদ্ভুত পরিবার।

কোনও কথা হয়নি?

তেমন কিছু নয়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ফলি আমার ছেলে কি না তাও আমি জানি না। ওর মায়ের চরিত্র ভাল নয়।

করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। আশেপাশে বহু ছেলে-ছোকরার যাতায়াত। কেউ হয়তো কথাটা শুনে ফেলতে পারে ভেবে গগন বরং সিটিয়ে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু বেশ স্বাভাবিক গলাতেই বলেন, তাই ও ছেলের জন্য আমার তেমন দুঃখ নেই।

ছটকু হতাশ হয় না। আস্তে করে বলে, কিন্তু আমার এই বন্ধুকে ফলির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এ নির্দোষ।

মহেন্দ্র ফাটা কাঁচের চশমা দিয়ে গগনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব নির্দোষ কি?

ছটকু দৃঢ়স্বরে বলল, অন্তত খুনের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।

তা হবে। সে সব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। মহেন্দ্র বললেন।

সংসারে বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা আর মূল্যহীনতায় ভুগে ভুগে মহেন্দ্র এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, আর কোনও ঘটনাকেই তেমন আমল দেন না। তার মন এখন শক্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ায় আর কারও কাছ থেকেই কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

ছটকু বলল, আমরা আপনার সাহায্য চাই, করবেন?

মহেন্দ্র একটু হাসলেন। সামনের চার-পাঁচটা দাঁত নেই। হাসিটা ভৌতিক এবং শ্লেষে ভরা। বললেন, আমার কিছু করার নেই। ফলির মা শাস্তি পাচ্ছে, একমাত্র সেটাই সান্ত্বনা! প্রায়শ্চিত্ত যে এখনও করতে হয়, চন্দ্রসূর্য যে বৃথা ওঠে না, সেটা জেনে বড় ভাল লাগছে।

ছটকু মহেন্দ্রবাবুর কাঁধ হাত বাড়িয়ে ধরে খুব নরম স্বরে বলে, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে সবই আমরা জানি। দরকার হলে আমার এই বন্ধু সাক্ষ্য দেবে, আপনার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নয়।

মানুষের দুর্বলতা কোথায় কোন সুপ্ত মনের কোণে থাকে কে জানে! কিন্তু ছটকু ঠিক জায়গায় খোঁচাটা মেরেছে। মহেন্দ্রর চোখ হঠাৎ উৎসাহে চিকমিকিয়ে ওঠে। দু পা হেঁটে মহেন্দ্র বলে, এখানে নয়। চলুন, একটা ঘর আছে।

ল্যাবরেটরির পাশেই একটা ছোট বসবার ঘর। ফাঁকা। সেখানে অনেক কটা কাঠের চেয়ার পড়ে আছে। তাতে ধুলোর আস্তরণ।

মহেন্দ্র গোটাতিনেক চেয়ার একটা ঝাড়নে পরিষ্কার করলেন। সবাই বসলে মহেন্দ্র বললেন, বেগমকে আমি জানি। তাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করি! তবে আমি শরীরের দিক থেকে খুব পটু ছিলাম না। বেগম বদমাইশি শুরু করল বিয়ের দু-তিন বছরের মধ্যে। সবই টের পেতাম, তবে তাকে রেড-হ্যান্ডেড ধরতে পারিনি কখনও।

চেষ্টা করেছিলেন?- ছটকু স্বাভাবিক কৌতূহল দেখায় যেন।

না। ভয় করত। মনে হত, রেড-হ্যান্ডেড ধরলে মুখোমুখি ওর লাভারের সঙ্গে লড়াই লেগে যেতে পারে। তা ছাড়া চক্ষুলজ্জা।

অথচ ধরতে চান?

খুব চাই। কিন্তু ধরলেই বা কী করব? থানা-পুলিশ আদালতে যেতে পারব না। তা হলে লোকলজ্জা। নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারব না। কারণ শক্তি নেই। এমনকী দুটো কথা

যে শোনাব, তাও বেগমের সঙ্গে গলার জোরে পেরে উঠব না। তাই ধরতে চাইলেও সেটা চাওয়াই থেকে যাবে।

এতকাল ধরে ব্যাপারটা সহ্য করলেন কী করে?

মানুষ সব পারে, পারতে হয়।

স্ত্রীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চান না?

মহেন্দ্র হেসে বললেন, শাস্তি ভগবান দিচ্ছেন।

ভগবানের দেওয়া শাস্তিতে কি মানুষের মন ভরে?

আমার মতো দুর্বলের সেইটেই একমাত্র ভরসা।

ছটকু হেসে ফেলে। তারপর পাইপ ধরিয়ে বলে, মহেন্দ্রবাবু, আমি নিজে ভাল বক্সার। গায়ের জোরে এখনও যে-কোনও পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা টানতে পারি। কিন্তু নিজের বউয়ের সঙ্গে আমি আজও এঁটে উঠতে পারিনি। আমি আপনার মতোই দুর্বল। কিন্তু সেটা মনের দুর্বলতা, শরীরের নয়। কাজেই আপনি শরীরের দিক দিয়ে দুর্বল বলেই নিজেকে দুর্বল ভাববেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে গায়ের জোরের অভাবে প্রকৃত সাহসীদের কেউ দুর্বল ভাবেনি।

মহেন্দ্র যেন বহুকাল পর এক ভরসার কথা পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, কথাটা খুব ঠিক। আমার মনের জোর কম নেই। কিন্তু বেগমের মতো মেয়েছেলের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানেই ফালতু ঝামেলায় জড়ানো। নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু বরাবর নিজেকে ছোট ভেবেছেন!

মহেন্দ্র প্রসন্ন হেসেই বললেন, কী করা ঠিক হত বলুন তো।

চাবকানো।- পাইপে টান দিয়ে ধীরস্বরে ছটকু বলে।

ওটা পারতাম না।

এবার পারবেন।

মহেন্দ্র গগনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি সাক্ষী দেবেন?

গগনের কান-মুখ গরম হয়ে ওঠে। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছটকুর সব বেহায়া কাণ্ড!

ছটকুই বলে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এই গগনের ফিজিকাল রিলেশন ছিল।

গগন ভেবেছিল মহেন্দ্র এ কথা শুনে ফেটে পড়বে।

কিন্তু তার বদলে মহেন্দ্র চেয়ার আর-একটু কাছে টেনে এনে বিগলিতভাবে বললেন, তা হলে এই প্রথম আমি একটা প্রমাণ পাচ্ছি। একটু বলুন তো এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা!

গগন লজ্জা ভুলে ভীষণ অবাক হয়।

ছটকু সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে বলে, ও কী বলবে? ওর তো দায়িত্ব ছিল না। চেহারাটা ভাল বলে আপনার স্ত্রীই ওকে পিক-আপ করে।

মহেন্দ্র গগনের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, চেহারাটা ভাল। আপনারা দুজনেই ব্যায়াম করেন, না?

করি।- ছটকু জবাব দেয়।

আমারও খুব শখ ছিল। হয়নি। অল্প বয়সেই সংসারে ঢুকে গেলাম। আমার স্ত্রী কী রকম করত আপনার সঙ্গে? গগনকে জিজ্ঞেস করেন মহেন্দ্র।

ছটকু গগনকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, বল না।

গগন টের পায়, মহেন্দ্র খুবই কুৎসিত মনোরোগে ভুগছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেহ-সম্বন্ধ নেই, ঘৃণা আর রাগের সম্পর্ক। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তার অবদমিত শারীরিক ক্ষুধা মেটেনি বলেই তা আজ বিকৃতভাবে তৃপ্তি খুঁজছে, স্ত্রীর প্রেমিকের কাছ থেকে তিনি সেই কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিবরণ চান।

ছটকু আবার ঠেলা দিয়ে চোখের ইশারা করে বলে, বল না।

মহেন্দ্রও বলে ওঠেন, ও কি খুবই কামুক? বাঘিনীর মতো?

গগন অস্পষ্ট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

কামড়ে দিত আপনাকে? মারত?

হ্যাঁ।

ছটকু বাধা দিয়ে বলে, আর সব পরে শুনবেন মহেন্দ্রবাবু, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক। সেদিন ফলির সঙ্গে আপনার কী কথা হয়?

মহেন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তবে সে উত্তেজনা আনন্দের। চোখ চকচক করছে, মুখটা উজ্জ্বল, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। উঠে গিয়ে ঘরের পাখাটা চালু করলেন। চারিদিকে ধুলো উড়তে লাগল বাতাসে।

মহেন্দ্র মুখোমুখি বসে বললেন, ফলি কোনও দিনই আমাকে পাত্তা দিত না। বুঝতেই পারছেন, মা যদি সম্মান না করে তার ছেলেমেয়েরাও কোনও দিন বাবাকে সম্মান করতে শেখে না। বেগম কোনও দিন আমাকে মানুষ বলেই মনে করেনি কিনা! তবে ফলি যখন খুব ছোট ছিল, তখন কিন্তু আমাকে ভীষণ ভালবাসত।

আপনি কি বরাবরই জানতেন যে, ফলি আপনার ছেলে নয়?

মহেন্দ্র ফাটা কাঁচের ভিতর দিয়ে ভৌতিক দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, ওই একটা বিষয়ে আমি আজও ডেফিনিট নই। ফলি যখন জন্মায় তখনও ওর মার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। কাজেই কী করে বলি ও আমারই ছেলে নয়? তবে ওর চেহারা স্বভাব কিছুই আমার মতো ছিল না।

তারপর?

বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর ফলি জন্মায়। তখন বেগম খুব বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে। আমি তখন ঝিমিয়ে গেছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখন খুব খারাপ। ফলি সে সময়ে জন্মায়। তার আগে অবশ্য আমি গোপনে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, সন্তানের বাপ হওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। তাই ফলি জন্মানোর পর আমি তাকে নিজের ছেলে মনে করে খুব ভালবাসতাম। পরে ও বড় হলে বেগম ওর মন বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু তার ফলে বেগমেরও কিছু লাভ হয়নি। ফলি ওকেও দেখতে পারত না। এক ছাদের তলায় আমরা তিন শত্রু বসবাস করতাম।

ফলির সঙ্গে আপনার ঝগড়া হত?

না, কারও সঙ্গেই আমার মুখোমুখি ঝগড়া ছিল না। তবে মানুষ মানুষকে অপছন্দ করলে সেটা মুখে বলার দরকার হয় না, এমনিতেই বোঝা যায়।

তা ঠিক।

তবে ফলির সঙ্গে আমার কখনও-সখনও কথা হত। ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে হতই না।

সেদিন কী কথা হল?

আমি সন্ধের বেশ কিছু পরে বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়িতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি চলছে। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছেই শুনলাম ফলি তার মাকে খুব মেরেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। এর আগেও ফলি কয়েক বার ওর মাকে মারধর করেছে। বড় হয়ে

মায়ের গুণের কথা শুনেছে তো! ছেলে হয়ে মায়ের বদমাইশি সহ্য করে কী করে? সে যাই হোক, গোলমাল দেখে আমি আর বাড়ির মধ্যে না ঢুকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু বাদে দেখি ফলি খুব জোরে হেঁটে আসছে। ওর মুখ-চোখ খুনির মতো। কী যেন হল আমার, ওকে ডাকলাম। ও থমকে দাঁড়াল। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি আমাকেও মারে। কিন্তু ও সব করল না। খুব ঠান্ডা গলায় বলল, নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারো না? আমি তার জবাব দিলাম না। মনে মনে জানি, আমাকে মারতে হবে না। মা ব্যাটায় নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে মরবে একদিন! যাক গে, ফলি আমাকে বলল, সিংহীদের বাগানে আমার সঙ্গে রাত আটটা নাগাদ দেখা কোরো! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

গিয়েছিলেন?

হা। তবে রাত আটটার অনেক আগে।

বলে মহেন্দ্র ফাটা কাঁচের ভিতর দিয়ে নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তার সেই দৃষ্টি এমনিতে যতই নির্বিকার মনে হোক, ছটকু টের পেল মহেন্দ্র কিছু একটা বলতে চান। তাই সে নরম স্বরে বলল, কী দেখলেন সেখানে?

ফলির সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু আগে আগে পৌঁছে ভাবলাম, জায়গাটা ঘুরে দেখি। বুড়ো সিংহীর অনেক টাকা ছিল। কৃপণ লোক ছিলেন। আমার ধারণা, সিংহীবাড়ির কোনও গুপ্ত জায়গায় বিস্তর লুকোনো টাকাকড়ি বা সোনাদানা আছে। আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই গুপ্তধনের শখ। একটা টর্চ ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ঘরের দরজায় তালা ছিল। তবে একটা জানালার পাল্লা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি সেই পাল্লা খুলে দেখি, লোহার গরাদের একটা শিক ভাঙা। ঢোকা যায় দেখে ঢুকেই পড়লাম। ঘরে ঢুকে দেখি, ধুলোটুলো কিছু নেই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। এদিক-ওদিক ঘুরে একটা ভিতর দিকের ঘরে গিয়ে দেখি, খাঁটিয়ায় বিছানা পাতা রয়েছে। শতরঞ্চি, মোমবাতি, তাস, সিগারেটের অনেক প্যাকেট আর খালি মদের বোতল। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই গুন্ডা-

বদমাশের আস্তানা। ভয় খেয়েও অবশ্য পালাইনি, ভাল করে চারধারের সবকিছু দেখে নিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ বাইরে কোথায় চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দোতলার সিঁড়ির তলায় গা-ঢাকা দিই। বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই ফলি আর কয়েকজন লোকের গলা পেলাম। খুব ঝগড়ার গলায় কথা হচ্ছিল। ফলি চিরকালের ডাকাবুকো। শুনলাম সে বলছে, গগনকে আজই খতম করব। তারপর তোদেরও ব্যবস্থা হবে। আমি তাদের কাউকেই দেখতে পাইনি। শুধু গলা শুনেছি।

কোনও সুর চেনা মনে হয়নি?

না। ফলির গলা ছাড়া আর কারও গলা চিনতে পারিনি। তবে একজনের গলা খুব মোটা। যেন মাইক লাগিয়ে কথা বলছে। সে ফলিকে বলল, গগন তোর মার সঙ্গে লটগট করেছে, তাতে আমাদের কী? আমরা খুনখারাবির মধ্যে নেই। একজন বুড়ো মানুষের গলাও পেয়েছিলাম বলে মনে হয়। তবে সে যে কী বলেছিল তা ধরতে পারিনি।

আর কিছু?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, না, কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল। তারপর আমি আর সেখানে থাকবার সাহস পাইনি।

ফলি আপনাকে কী বলতে চেয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারেন? নিভন্ত পাইপে আবার আগুন দিয়ে ছটকু বলে।

না। আপনাদের সঙ্গে পরে আবার কথা হতে পারে। এখন আমার কাজ আছে।-বলে মহেন্দ্র উঠে পড়লেন।

ছটকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ফলির জন্য আপনার কোনও শোক নেই?

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বলেন, থাকার কথাও নয়। একে সে আমার ছেলে কি না তাই সন্দেহের বিষয়, তা ছাড়া অতি বদমাশ ছেলে।

১৩. সত্যুর হাতে-মুখে রক্ত

কী হয়েছিল তা কেউ বলতে পারবে না।

সত্যুর হাতে-মুখে রক্ত চটচট করছে। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। গোঙাতে গোঙাতে সে কয়েকবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওদিকে কালু নট নড়নচড়ন হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর।

সিংহীদের নির্জন বাগান। এখান থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনতে পায় না। সন্তু যখন শেষবার জ্ঞান ফিরে পেল তখন তার শরীর এত দুর্বল যে, বাগানটা হেঁটে পার হয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবাই যায় না। চোখে সে সকছু সাদা দেখছে। বমি আসছে বুক গুলিয়ে। ওঠার ক্ষমতা নেই। হাঁফ ধরে যাচ্ছে শুধু টানার পরিশ্রমে।

হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনওক্রমে বসে। তারপর বহু দিন বাদে তার চোখ দিয়ে হু-হুঁ করে কান্নার জল নেমে আসে।

আর সেই কান্নার আবেগে আর-এক বার সে জ্ঞান হারায়।

জ্ঞান ফেরে আবার। তাকিয়ে দেখে সে একটা ঘরে শুয়ে আছে। তার মাথা-মুখ ভেজা।

চোখ খোলার পরই সে তার বাবাকে দেখতে পেল। দাড়িওলা সেই ভয়ংকর মুখ, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। দয়ামায়া রসকষহীন এক মানুষ এই নানক চৌধুরী।

ঠান্ডা গলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কালুকে মেরেছ?

একথার জবাব সন্তুর মাথায় আসে না। কিন্তু খুব আবছা হলেও তার মনে পড়ে, কালুকে মারবার সুযোগ সে পায়নি। ছুরি নিয়ে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে কালুর ইটের ঘায়ে সে মুখ

থুবড়ে পড়ে যায়। তারপরও আবছা মনে পড়ে, কালু ছুটে এসে ইটটা তুলে তার মুখে মাথায় বার বার মেরেছে। তারপরও যদি সে কালুকে মেরে থাকে, তবে তা সজ্ঞানে নয়।

সন্তু বলল, মনে নেই।

নানক গম্ভীর হয়ে বলেন, কালুর পেটে আর বুকে ছুরির জখম। কাজটা ভাল করোনি।

এক ভয়ংকর আতঙ্কে সন্তু চোখ বুজল। খানিক বাদে আবার চোখ খুলল। সে শুয়ে আছে সিংহীদের বাড়িতে। এই ঘরেই একদা তাকে নীলমাধব মেরেছিল। এ বাড়িতেই সে একদিন গুন্ডা বেড়ালকে ফাঁসি দিতে এসে এক রহস্যময় অচেনা লোকের হাতে মার খায়।

সন্তু ডাকল, বাবা!

তার গলাটা কেঁপে যায়।

নানক সামান্য ঝুঁকে বলেন, কী?

এ বাড়িতে কে থাকে?

কে থাকবে?- নানক অবাক হয়ে বলেন, কেউ থাকে না।

সন্তু অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। তেষ্টায় গলা শুকনো। জিভে ঠোঁট চেটে নিয়ে সে বলে, কেউ থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। একবার কে যেন এখানে আমার মাথায় পিছন থেকে লাঠি মেরেছিল।

নানক ঘটনাটা জানেন। চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, জানি না।

সন্তু তার বাবার দিকে তাকায়। বাবার পাঞ্জাবির হাতায় রক্ত লেগে আছে। দাড়ির ডগাতেও তাই। তাকে বাগান থেকে তুলে আনবার সময় বোধহয় লেগেছে। তবু সন্তু তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে নানা কথা উঁকি মারে।

সন্তু হঠাৎ বলল, আমি কালুকে মারিনি।

তুমি ছাড়া কে?

তা জানি না। তবে আমি নই।

নানক চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, সে কথা এখন ভাববার দরকার নেই। ঘুমোও।

আমি বাড়ি যাব।

একটু পরে। এখন তোমাকে নিতে গেলে আরও ব্লিডিং হতে পারে।

সন্তু তার বাবার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বলে, মার কাছে যাব। আমাকে এখানে রেখেছেন কেন?

নানক গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি সময়মতো এসে না-পড়লে এতক্ষণ তুমি বাগানেই পড়ে থাকতে।

সন্তু উঠবার চেষ্টা করে বলে, কালু কি এখনও বাগানেই পড়ে আছে?

নানক ঠান্ডা গলায় বলেন, ও বোধহয় বেঁচে নেই।

কিন্তু আমি ওকে মারিনি। ও একটা মার্ডার কেস-এর ভাইটাল আই-উইটনেস।

এ সব কথা সন্তু ডিটেকটিভ বই পড়ে শিখেছে। সে জানে কালু মরে গেলে ফলির খুনের কিনারা হবে না।

নানক তার বুকে হাতের চাপ দিয়ে ফের শুইয়ে দিলেন। একটু কড়া গলায় বললেন, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শোনো, কালুর সঙ্গে যে তোমার আদৌ দেখা হয়েছে তা আর কাউকে বলতে যেয়ো না।

কেন?

নানক বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমার ভালর জন্যই বলছি। এইটুকু বয়সেই তুমি সব রকম অন্যায় করেছ। তুমি ইনকরিজিবল। কিন্তু তবু আমি চাই না, পুলিশ তোমাকে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাক।

কিন্তু কালুকে আমি মারিনি।

সেটা আমি বিশ্বাস করি না, পুলিশও করবে না। কাজেই বেয়াদবি করে লাভ নেই। যা বলছি শোনো।

সন্তু আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে সে তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

নানক বললেন, তুমি ছাড়া কেউ কালুকে মারেনি।

আমি নই –সন্তু গোঁ ধরে বলে।

তুমিই। আমি ভাবছি তোমাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেব। এখানে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

সন্তু চুপ করে থাকে। কিন্তু তার মন নিপ নয়। সেখানে অনেক কথার বুদ্বুদ উঠছে। সে খুব নতুন এক রকম চোখে তার বাবার দিকে তাকায়। তারপর এত ব্যথা আর যন্ত্রণার মধ্যেও ক্ষীণ একটু হাসে।

.

গগন আর ছটকু যখন সিংহীদের বাড়িতে ঢুকল তখন বিকেল যাই-যাই। এর আগে তারা আর-একটা মস্ত কাজ সেরে এসেছে। মৃত্যুপথের যাত্রী কালুকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে।

কালুর জ্ঞান ফেরেনি। ফেরার সম্ভাবনাও খুব কম। অক্সিজেন চলছে। ওই অবস্থাতেই ডাক্তাররা তার ওপর অপারেশন চালিয়েছে। জানা গেছে তার ফুসফুস ফুটো হয়েছে, পেটের দুটো নাড়ি কাটা। বাঁচা- মরার সম্ভাবনা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

ছটকু পুলিশকে ঘটনাটা ফোনে জানিয়ে দিল। তারপর গগনকে নিয়ে বিকেলের দিকে সোজা আবার গাড়ি চালিয়ে সিংহীদের পোড়ো বাড়িতে।

ছটকু জানে। জেনে গেছে।

সদর দরজায় তালা ছিল, যেমন থাকে। ছটকু একটু চার দিক ঘুরে দেখল। পিছনের বাথরুমে মেথরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢোকে ছটকু। সঙ্গে গগন।

ভিতরে অন্ধকার জমেছে। এখানে-সেখানে কিছু পুরনো আন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথুরে মূর্তি। শেষ রোদের কয়েকটা কাটাছেঁড়া রশ্মি পড়েছে হেথায়-হোথায়।

বেড়ালের পায়ে এগোয় ছটকু। এ ঘর থেকে সে ঘর।

অবশেষে ঘরটা খুঁজে পায় এবং চৌকাঠের বাইরে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভিতরে সন্তু ক্ষীণ একটু ব্যথার শব্দ করে বলে, আমি বাড়ি যাব বাবা।

যাবে। সময় হলেই যাবে।

ছটকু সামান্য গলাখাকারি দেয়।

অন্ধকার ঘরে নানকের ছায়ামূর্তি ভীষণ চমকে যায়।

ছটকু ঘরে ঢোকে। মাথা নেড়ে বলে, কাজটা ভাল হয়নি নানকবাবু।

নানক অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।

ছটকু গগনকে ডেকে বলে, তুই সন্তুকে পাজাকোলে তুলে নিয়ে যা। ওকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।

গগন ঘরে ঢোকে। গরিলার মতো দুই হাতে সন্তুকে বুকে তুলে নেয়। নিজের ছাত্রদের প্রতি তার ভালবাসার সীমা নেই।

নানক কী একটু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

গগন সন্তুকে নিয়ে চলে গেলে ছটকু পাইপ ধরায়। তারপর নানকের দিকে চেয়ে বলে, আমি সবই জানি। কালু মরেনি।

নানক কথা বললেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ছটকু বলল, কিছু বলবেন?

নানক খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, আমার ছেলেটা মানুষ হল না।

আমরা অনেকেই তা হইনি। কালুকে কে মারল নানকবাবু?

বদমাশ এবং পাজিদের মরাই উচিত।

কিন্তু সে কাজ আপনি নিজের হাতে করতে গেলেন কেন?

নানক আস্তে করে বললেন, সন্তুর জন্য। ভেবেছিলাম সন্তুকে চিরকাল একটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখব। সেই ভয়ে ও ভাল হয়ে যাবে।

নিজের ছেলের স্বার্থে আর-একটা ছেলেকে মারতে হয়?

মাঝে মাঝে হয়।

ছটকু পাইপ টানল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, কালুকে টাকাটা কে দিয়েছিল?

আমি। ভেবেছিলাম, কালুকে হাত করে গগনকে ফাসাব। ওর ব্যায়ামাগারটা তুলে দেওয়া দরকার। সেখান থেকে গুন্ডা বদমাশের সৃষ্টি হচ্ছে।

ছটকু হেসে বলে, আপনি সমাজের ভাল চান, ছেলের ভাল চান, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা কিছু অদ্ভুত।

বোধহয়।– শান্ত স্বরেই নানক বলেন।

ছটকু আবার হেসে বলে, আর ফলির ব্যাপারটা?

জটিল নয়। ওকে যে মেরেছে সে অন্যায় করেনি।

কিন্তু কে মেরেছে?

নানককে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু গলার স্বরে ঝাঁঝ ফুটল। বললেন, আপনি কে?

আমি গগনের বন্ধু। গগনকে খুনের মামলা থেকে বাঁচাতে চাই।

অ। তা বাঁচবে। গগন খুন করেনি।

সেটা জানি। করল কে?

আমিই করিয়েছি। ফলি এ পাড়ার ছেলেদের নষ্ট করছিল। ড্রাগের নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া আমার প্রতিবেশী নরেশ নজুমদারের বাড়িতে থাকার সময়ে সে এক কুমারীর

সর্বনাশ করে। নানক একটু থেমে বললেন, আমি সমাজের ভাল চাই। রাষ্ট্র যা করছে না তা আমাকেই করতে হবে।

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, বুঝলাম।

বুঝলে ভাল।

ছটকু মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু যে-সব গুন্ডাকে টাকা খাইয়ে আপনি ফলিকে মারার কাজে লাগিয়েছিলেন তারাই কি ভাল? তাদের অবস্থা কী হবে?

তারাও মরবে।

কী করে?

তারা আমার টাকা খায়। এ বাড়িতে তাদের আচ্ছা আমি মেইনটেন করি। একে একে সবাই যাবে। দুনিয়ায় খারাপ, লোচ্চা, বদমাশ একটাকেও বাঁচিয়ে রাখব না।

ছটকু নিঃশব্দে বসে রইল। মনটা দুঃখে ভরা।

বাইরে ক্ষীণ পুলিশের বুটের আওয়াজ শুনল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটকু উঠে দাঁড়ায়।